ইনকিলাবে হাকীকী

(প্রকৃত বিপ্লব)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রা.)

ইনকিলাবে হাকীকী
(প্রকৃত বিপ্লব)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রা.)

ভাষান্তর
আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী প্রকাশনা

প্রকাশক:
মাহবুব হোসেন
প্রকাশনা সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম বাংলা অনুবাদ : ২৭ মে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
২১ জমাঃ আউয়াল, ১৪২৯ হিজরী

সংখ্যা : ২,০০০ কপি

মুদ্রণে:
ইন্টারকন এসোসিয়েটস
৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার
ঢাকা-১০০০ ।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর পবিত্র কালামের সূরা নূরে প্রদত্ত মু'মিনদেরকে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি এবং খাতামান্ নবীঈন ইমামুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর ভবিষ্যদ্বাণী **'খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়ত'**-এর পূর্ণতায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতে ১৯০৮ সনের ২৭ মে ইসলামী খিলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সনের ২৭ মে আহমদীয়া খিলাফতের একশ বছর পূর্তি হবে, ইনশাআল্লাহ। এতদোপলক্ষ্যে নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফাতুল মুসলেমীন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই:) ২০০৫ সনে যুক্তরাজ্যের জলসায় 'আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী (১৯০৮-২০০৮) উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জামাতের সামনে এক সুদূর প্রসারী রূহানী কর্মসূচী পেশ করেন যার মধ্যে প্রকাশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত প্রকাশনার তালিকায় বেশ কয়েকটি বইয়ের মধ্যে **'ইনকিলাবে হাকীকী'**-এর বাংলা অনুবাদ **'প্রকৃত বিপ্লব'** বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। এটি মূলত একটি বক্তৃতা যা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা:) ১৯৩৮ সনের ২৮ ডিসেম্বর কাদিয়ানের সালানা জলসায় দিয়েছিলেন। তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান প্রথম এ বক্তৃতাটি **'ইনকিলাবে হাকীকী'** নামে পুস্তক আকারে প্রকাশ করে। পরে আল-শিরকাতুল ইসলামিয়া ২রা অক্টোবর ১৯৫৭ সনে দ্বিতীয় বার এ পুস্তকখানা প্রকাশ করে।

'ইনকিলাবে হাকীকী' পুস্তকখানা **'প্রকৃত বিপ্লব'** নামে বাংলায় অনুবাদ করেন আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব। অনুবাদটি দেখে দিয়েছিলেন পাবলিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান, আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী মরহুম। আল্লাহ তা'লা উভয়কে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

মহান আল্লাহ তা'লা আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী পূর্তির এ শুভলগ্নে পুস্তকখানা প্রকাশের সৌভাগ্য দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আশা করি পুস্তকখানা বাংলা ভাষাভাষি পাঠক পাঠিকাদেরকে ইসলামের প্রকৃত বিপ্লব বুঝতে সহায়ক হবে। এটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তা'লা উত্তম পুরস্কার দিন; আমীন।

মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর ও চেয়ারম্যান
খেলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী-২০০৮ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ
২৭ মে, ২০০৮

অনুবাদকের দু'টি কথা

মহান ঐশী গ্রন্থ কুরআন মাজীদ ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি, প্রায় ৭ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্‌র প্রথম খলীফা ও নবী হযরত আদম আলায়হেস সালামের মাধ্যমে গোড়াপত্তন হয়েছিল বর্তমান সভ্যতার। মানুষের সেই পর্যায়ে আসতে মানুষকে যে এক মহাকাল পাড়ি দিতে হয়েছিল তা-ও আমরা কুরআন মাজীদ থেকে জানতে পারি (সূরা দাহ্‌র)। শিশু মানব-সভ্যতাকে পুর্ণতায় পৌঁছাতে বিগত প্রায় ৭ হাজার বছরে মহান আল্লাহ্ তাআলা এ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগে পাঠিয়েছিলেন অসংখ্য নবী-রসূল। সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন জাতিসত্তা ও ধর্মের। আপাতদৃষ্টিতে ধর্মগুলো আলাদা আলাদা মনে হলেও এগুলো সেই একই বিশ্ববিদ্যাপীঠের শ্রেণীবিশেষ। এটাও আমরা কুরআনের শিক্ষা থেকে জানতে পারি। সবগুলো ধর্মই একই মালার ফুলবিশেষ। পরিপূর্ণতার যাত্রাপথে এগুলো মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা দিয়েছে এবং পার্থক্য করতে বারণ করেছে একমাত্র ধর্ম ইসলামই। আর ইসলামই হলো বিশ্বধর্মরূপ অট্টালিকার পরিপূর্ণ আকৃতি। এর মহান প্রবর্তক হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

আগেই বলেছি, মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ধর্ম ইসলামকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সময়োপযোগী বিভিন্ন শিক্ষাসমেত যুগ ও জাতি পর্যায়ে নবী আলায়হিমুস সালামগণকে এ বিশ্বে আবির্ভূত করেছিলেন। তাঁরা এসে নিজ নিজ যুগে ও নিজ নিজ স্থানে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী তথা নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিলেন। ঐশী যাত্রা পথের বাঁকে বাঁকে এগুলো আলাদা দৃশ্যমান হলেও এগুলো ছিল আসলে এক চূড়ান্ত বিপ্লবের খন্ড খন্ড অবস্থা ও পর্যায়। স্থান কাল ভেদে এগুলোও ছিল এক একটি বিপ্লব, যদিও পরবর্তীতে বিকৃত রূপ ধারণ করে অবস্থান করছে। এগুলো ঘটেছিল হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধ, যরথুস্ত্র, কনফুসিয়স প্রমুখ নবী আলায়হিমুস সালামগণের মাধ্যমে। এ নবীগণের শিক্ষার ফলশ্রুতিতেই বিভিন্ন দেশ ও জাতিতে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপায়ন, যেমন আর্য সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, পারশ্য সভ্যতা, বেবিলনীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রভৃতি।

কিন্তু ধর্মের চূড়ান্ত ও বিশ্বরূপ প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল বিশ্বনবী আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। যথাসময়ে তিনি (স.) এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে এক বিশ্বজনীন সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলেন। সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন আকাশ ও এক নতুন বিশ্বের। এর একটি ঝলক আমরা দেখি ইসলামের আবির্ভাবের পরবর্তী তিন শ' বছর সময় সীমায়। কিন্তু ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসলামের পূর্ণ সূর্য রাহুর কবলে পড়ে অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। ইসলামের

সূর্যকে রাহুমুক্ত করার লক্ষ্যে হযরত নবী করীম (স.)-এর আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তাঁর (স.) দ্বিতীয় বিকাশ (সূরা জুমু'আ) হিসেবে তাঁরই এক গোলাম আবির্ভূত হন পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার বাটালা পরগনার কাদিয়ান গ্রামে। ইসলামের বিশ্বরূপ প্রকাশের লক্ষ্যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর স্কন্ধে ন্যস্ত হলো একটি প্রতিশ্রুত বিপ্লবের দায়িত্ব। তাঁর মাধ্যমে নবী করীম (স.) ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় খিলাফত 'আলা মিন হাজিন নবুওয়ত। কিভাবে এ প্রতিশ্রুত বিপ্লব সাধন করা হবে এবং কিভাবে বিশ্বে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়ে বিশ্বে এক নতুন ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা হবে এর বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী মুসলেহ মাওউদ মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) **ইনকিলাবে হাকীকী** নামের এ পুস্তকে বর্ণনা করেছেন।

এটা ছিল তাঁর (রা.) একটি বক্তৃতা। তিনি ১৯৩৮ সনে কাদিয়ানের সালানা জলসায় ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে এ ভাষণটি দিয়েছিলেন। তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান প্রথম এ বক্তৃতাটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করে। আল্ শিরকাতুল ইসলামীয়া ২রা অক্টোবর ১৯৫৭ সনে দ্বিতীয় বার এ পুস্তকখানা প্রকাশ করে।

খাকসার এ পুস্তকখানার বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি 'প্রকৃত বিপ্লব' নামে। এ অনুবাদটি ১৯৯৭-১৯৯৮ সনে ধারাবাহিকভাবে পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশিত হয়। অনেক পরিশ্রম করে অনুবাদটি দেখে দিয়েছিলেন পাবলিকেশন কমিটির তদানীন্তন চেয়ারম্যান মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী সাহেব। আল্লাহ তাআলা মরহুমকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দিন।

শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলী উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের অনুমোদনক্রমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এটি পুস্তকাকারে ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। এ পুস্তকখানা বাংলা ভাষাভাষি ভাইবোনকে প্রকৃত বিপ্লব বুঝতে সহায়ক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। এ পুস্তক প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সবাইকে আল্লাহ্ তাআলা উত্তম পুরস্কার দিন, আমীন।

বিনীত নিবেদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
১০ অক্টোবর, ২০০৭ইং

সূচিপত্র

০১. প্রত্যেক আন্দোলন একটি আহ্বানের প্রত্যাশী ৭
০২. নিজ দাবীতে যে প্রত্যাদিষ্ট দাবীকারক সফলতা লাভ করে থাকেন তিনি কখনো মিথ্যেবাদী হন না ৮
০৩. সংশোধনের মাধ্যম কি মৈত্রী না যুদ্ধ? ৯
০৪. পার্থিব পাঁচটি মহান আন্দোলন ১৪
০৫. আর্য সভ্যতার বাণী– বর্ণগত বৈশিষ্ট্য ১৬
০৬. রোমান সভ্যতার ভিত্তি আইন ও মানবাধিকারের ওপর ১৯
০৭. পারশ্য সভ্যতার আহ্বান– উত্তম আচরণ ও রাজনীতি ১৯
০৮. বেবিলনীয় সভ্যতার ভিত্তি জ্যামিতি ও জোতির্বিদ্যার ওপর ২০
০৯. কুরআন করীমে বেবিলনীয় সভ্যতার নিদর্শনাবলী ২১
১০. পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শন ২৬
১১. বড় বড় আন্দোলনের সফলতার উপকরণ ২৭
১২. ধর্মীয় জগতেও প্রকৃত সফলতা বিপ্লবের মাধ্যমেই হয়ে থাকে ৩০
১৩. 'আস্‌সা'আত' অর্থ ৩৫
১৪. মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর জন্যে কুরআনে ব্যবহৃত 'কিয়ামত' শব্দ ৪০
১৫. প্রত্যেক নূতন নবীর যুগে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টির ওপর মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর সাক্ষ্য ৪৪
১৬. আদমের যুগের বাণী ৪৬
১৭. সভ্যতা-সংস্কৃতির তাৎপর্য ৫০
১৮. হযরত নূহ (আ:)-এর আন্দোলন ৫৬
১৯. ইবরাহীমি আন্দোলন ও এর বাণী ৫৯
২০. মূসায়ী যুগ ও এর বাণী ৬৩
২১. ঈসা (আ:)-এর যুগের বাণী ৬৮
২২. মুহাম্মদী (স:) যুগের বাণী ৭০
২৩. আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও ঈসায়ী বৈশিষ্ট্যাবলী ৭৫
২৪. নেয়ামত কী? ৭৯
২৫. ইসলামের মহান বিপ্লব ৮১
২৬. ইসলামী শিক্ষা উত্তম হওয়ার প্রমাণ ৮২
২৭. কুরআনী শিক্ষার ব্যাপকতা ৮৬
২৮. উম্মতের ঐক্যের ভিত্তি ৮৭
২৯. হযরত মসীহ্ (আ:)-এর আবির্ভাবের পরিমন্ডল ৯০
৩০. ইসলাম ও অন্য ধর্মের মাঝে সাদৃশ্যের আসল কারণ ৯২
৩১. পাশ্চাত্যের নীতি ৯৫
৩২. সপ্তম পর্যায়ের বিপ্লব হলো মুস্তাফা (স:)-এর শিক্ষার পুনর্জীবন ৯৬
৩৩. ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমসমূহ ৯৮
৩৪. ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়ার বিজয় ১০০
৩৫. আহমদীয়তের বিজয় ও কর্মক্ষেত্র ১০১
৩৬. প্রকৃত বিপ্লব সৃষ্টিতে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সাল্লামের অংশীদারীত্ব ১০৬
৩৭. তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য ১০৮
৩৮. সংস্কৃতি ও কৃষ্টি প্রসঙ্গে ইসলামী শিক্ষা ১১১
৩৯. ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার উপায়সমূহ ১১৫
৪০. শরীয়তের পুনরুজ্জীবনের দুটি অংশ ১১৭
৪১. মহিলাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ দেয়া ১১৮
৪২. নারীদের অধিকারসমূহ ১২১
৪৩. ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার অসুবিধাসমূহ ১২৫
৪৪. বন্ধুগণকে উপদেশ ১২৬

ইনকিলাবে হাকীকী
(প্রকৃত বিপ্লব)

আজ একটি আশ্চর্য বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। এটা এ রকমই, চাইলে একটি কথা বলে বসে গেলেও বিষয়বস্তু শেষ হয়ে যায়। আবার যদি চাই আর আল্লাহ্ তাআলা সৌভাগ্য দেন তাহলে কয়েকদিন বারো ঘন্টা করে বক্তৃতা হতে থাকলেও বিষয়বস্তু শেষ হয় না। আবার এটাও হতে পারে, চার পাঁচ ঘন্টায় যেন তেন করে বিষয়বস্তু শেষ করে দিই। সুতরাং সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি শেষ ও মাঝামাঝি পদ্ধতিটি অবলম্বন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। ওয়াল্লাহুল মুওয়াফ্ফিকু (আর আল্লাহ্ই পূর্ণ সৌভাগ্য দেয়ার মালিক)।

জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত করার নীতি

সবচেয়ে প্রথমে আমি এ বিষয়ের প্রতি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সারা জগতে সব সময় দুটি নীতি কার্যকরী রয়েছে, এ বিষয়টি ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত । আর জাতীয় জীবন এ দুটি নীতি ছাড়া কখনো প্রতিষ্ঠিত থাকে না। হযরত আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ধর্মীয়ই বা কি আর পার্থিবই বা কি বুদ্ধিগতই বা কি আর জ্ঞানভিত্তিক ও কর্মভিত্তিকই বা কি কোন আন্দোলনই এ দুটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া সত্যিকারভাবে সফলকাম হয়নি।

প্রত্যেক আন্দোলন একটি আহ্বানের প্রত্যাশী

প্রথম নীতিতো হলো এই, কোন আন্দোলন পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে সফলকাম হতে পারে না যতক্ষণ এতে কোন নতুন বাণী বা আহ্বান না থাকে। অথবা কমপক্ষে সে সময়ের লোকেরা একে ভুলে বসে গিয়ে থাকে। যেমন, আমাদের এ দেশে এমনসব সংগঠন সফলতার সাথে কার্যকর রয়েছে যাদের উদ্দেশ্য এই, সেগুলো লোকদের মাঝে এ আন্দোলন চালাতে থাকে যে, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানো দরকার। কেননা, আমাদের দেশে সাধারণত ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায় না। কিন্তু লন্ডন বা বার্লিনে এ রকম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে, যার উদ্দেশ্য লোকদের মাঝে এ আন্দোলন চালানো যে, তোমরা পড়াশুনার জন্যে ছেলেপেলেদের স্কুলে পাঠাও তাহলে তা কখনো চলবে না। কেননা, লোকেরা বলবে, আমরা যখন সবাই আমাদের ছেলেপেলেদের স্কুলে পাঠিয়েই থাকি তখন

এ ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করায় কী লাভ? কিন্তু সেখানে এমন কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে যা বলে, তোমাদের ছেলেপেলেদের অমুক ধরনের নতুন শিক্ষা প্রদান করো তাহলে যেহেতু এতে একটি নতুন আহ্বান থাকবে তাই সেই আন্দোলন লাভজনক বলে প্রতীয়মান হলে একে উপস্থাপনকারী সংগঠন জনপ্রিয় ও সফলকাম হতে পারবে। মোটকথা সেসব আন্দোলনই পৃথিবীতে সফলকাম হয়ে থাকে যাতে এমনসব বিষয় দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে যা সে সময় পর্যন্ত দুনিয়ার দৃষ্টিতে লুপ্ত থাকে বা তা সর্বৈব নতুন। এসব বিষয়কে ইউরোপবাসী 'আহ্বান' বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

আমি যখন ইউরোপ গিয়েছিলাম, সাধারণভাবে আমাকে এ প্রশ্নই করা হচ্ছিলো, দুনিয়ার জন্যে আহমদীয়ত কী বাণী বয়ে নিয়ে এসেছে? অর্থাৎ আহমদীয়তের কোন নীতিটি বা আহমদীয়তের মাঝে এমন কোন শিক্ষাটি রয়েছে, যা জগৎ অবহিত নয় অথচ আহমদীয়ত তা উপস্থাপন করে থাকে? অথবা যেদিকে জগতের পুরো দৃষ্টি এখনও পতিত হয়নি অথচ এর প্রতি আহমদীয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়?

কুরআন করীমও এ নীতিকে স্বীকার করে এবং বলে– **ফা আম্মায্ যাবাদু ফা ইয়ায্হাবু জুফা'আন-ওয়া আম্মা মা ইয়ানফা'উন্নাসা ফা ইয়ামকুসু ফিল আরয-কাযালিকা ইয়াযরিবুল্লাহুল আমসাল** অর্থাৎ এখন ফেনার অবস্থা এই, এটা (নিক্ষিপ্ত হয়ে) ব্যর্থ হয়ে যায় আর যা মানুষের উপকারে আসে (যেমন পানি) তা ভূপৃষ্ঠে স্থায়ী থাকে। এভাবে আল্লাহ্ দৃষ্টান্তগুলো বর্ণনা করে থাকেন (সূরা রা'দ: ১৮)।

নিজ দাবীতে যে প্রত্যাদিষ্ট দাবীকারক সফলতা লাভ করে থাকেন তিনি কখনো মিথ্যেবাদী হন না

এ আয়াত থেকে হযরত মসীহ মাওউদ আয়হেস সালাম ইস্তিম্বাত বা অনুসিদ্ধান্ত (অর্থাৎ কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা) করতে গিয়ে এ নীতি উপস্থাপন করেছেন, এমন প্রত্যেক দাবীকারক যার দাবী দুনিয়া গ্রহণ করেছে এবং দীর্ঘ দিন ধরে জাতিসমূহ তার শিক্ষার ওপর আমল করতে থাকলে এটা সুনিশ্চিত, সেই দাবীকারক খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন।

কোন কোন অজ্ঞ ও মূর্খ মৌলবী বলতে থাকে, তিনি এই নীতি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন? এসব লোক কুরআন নিয়ে চিন্তা না করে কেবল আপত্তি উত্থাপন করে যাচ্ছে অথচ উপরোক্ত আয়াত এবং আরও কোন কোন আয়াত

থেকে এ নীতি ইস্তিম্বাত করা হয়। আর অকাট্যভাবে এটা প্রমাণিত হয়, এমন প্রত্যেক ধর্ম যা খোদা তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত বলে দাবী করে হাজার হাজার বছর ধরে দুনিয়াতে টিকে থাকে এবং হাজার হাজার মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে থাকলে এটা মিথ্যে প্রতিপন্ন হতে পারে না। আর এর সম্বন্ধে এটা স্বীকার করে নিতে হয়, খোদা তাআলার পক্ষ থেকে এটা অবতীর্ণ হয়েছিলো। এর ভিত্তিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) বলেছেন, হযরত কৃষ্ণ, হযরত রামচন্দ্র ও হযরত বুদ্ধও আল্লাহ্ তাআলার নবী ছিলেন।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) নিজের পক্ষ থেকে এ বিষয়টি তৈরী করে নিয়েছেন বলে বিরুদ্ধবাদীদের এ আপত্তি কুরআনী জ্ঞান সম্বন্ধে তারা যে অনবহিত কেবল এরই প্রমাণবাহী। নচেৎ এ আয়াতে, যা আমি এখনই পাঠ করেছি এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি আয়াতে এ নীতি মজুদ রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন– **ফা আম্মায্ যাবাদু ফা ইয়ায্হাবু জুফা'আন** অর্থাৎ যা অকল্যাণজনক হবে তা নষ্ট হয়ে যাবে। **ওয়া আম্মা মা ইয়ানফাউন্নাসা ফাইয়ামকুসু ফিল আরয** অর্থাৎ, কিন্তু লোকদের উপকার করে এমন জিনিষ স্থায়ী হবে। আর কোন্ লোক বলতে পারে খোদা তাআলার প্রতি মিথ্যারোপ করা কল্যাণপ্রদ। আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ অবশ্যই বিধ্বংসী কর্ম এবং দুনিয়াতে এর শিকড় গেড়ে যাওয়ার কথা দূরে থাকুক আল্লাহ্ তাআলা তো কোন মিথ্যারোপকারীকে শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দেন না।

অতএব কোন আন্দোলন দুনিয়াতে সফলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকলে এর অর্থ এই, অবশ্যই এটা দুনিয়ার জন্যে এমন কোন বাণী ও আহ্বান নিয়ে এসেছে যা কল্যাণপ্রদ। এক চরম মিথ্যাবাদী ও মিথ্যোরোপকারীরাও কি এরূপ বাণী নিয়ে আসতে পারে যা মানুষের জন্যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে কল্যাণজনক হয় ও দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকে? নির্বোধের মাথায়ই কেবল এরূপ ধারণার জন্ম হতে পারে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এহেন ধারণা পোষণ করতে পারেন না।

সংশোধনের মাধ্যম কি মৈত্রী না যুদ্ধ?

পৃথিবীতে প্রচলিত দ্বিতীয় নীতি এবং ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার আন্দোলনকে সফলকাম করার ক্ষেত্রে যা জরুরী তাহলো এই, সংশোধনের জন্যে সব সময় দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়– মৈত্রী অথবা যুদ্ধ। অর্থাৎ হয়তো মৈত্রীর মাধ্যমে সেই আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে হয় নয়তো যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মাধ্যমে ঘটাতে হয়। অথবা সেসব কথা-বার্তা বা ধ্যান-ধারণা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া হয়। জনগণ এর ওপর তর্ক-বিতর্ক করে এবং পরিশেষে এগুলো নিজেদের মনে স্থান

দেয় ও নিজেদের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যেভাবে আগের দিনের লোকেরা পৃথিবীকে চেপ্টা বলে থাকতো। বরং এখনও এরূপ লোক পাওয়া যায়, যারা পৃথিবীকে গোলাকৃতি মনে করে না, বরং চেপ্টা মনে করে থাকে। যেমন, আমি একবার লাহোর গেলাম। ইসলামীয়া কলেজ হলে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমার বক্তৃতার মাঝেই দাঁড়িয়ে গেলো। বল্লো, প্রশ্ন-উত্তরের সুযোগ দেয়া হবে কি হবে না? সভাপতি সাহেব জানতে চাইলেন, আপনি কী বলতে চান? তিনি বলতে লাগলেন, আমি বলতে চাই, পৃথিবী গোলাকার নয় চেপ্টা। আমার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্ক করা যেতে পারে। তিনি (সভাপতি) বল্লেন, এ বক্তৃতায় পৃথিবী গোলাকার বা চেপ্টা হওয়ার উল্লেখ নেই। তিনি (অর্থাৎ লোকটি) বলতে থাকলেন, থাক বা না থাক, এমন গরুত্বপূর্ণ কথার উল্লেখ কিভাবে পরিত্যাগ করা যেতে পারে?

মোটকথা এখনও এরূপ লোক পাওয়া যায়, কিন্তু খুবই কম। কিন্তু প্রাথমিক কালে মুসলমান ছাড়া প্রায় সব লোকই পৃথিবীকে চেপ্টা বলতো। মুসলমানদের মাঝে নি:সন্দেহে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ধারণা প্রচলিত ছিলো। আর ইউরোপের লোকেরা এর বিরোধিতা করতো। যেমন, যে সময়ে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার প্রশ্ন উঠলো তখন ইউরোপের লোকেরা একে খুবই দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করলো এবং বিরোধিতা শুরু করলো। কিন্তু মুসলমানদের মাঝে দীর্ঘ দিন ধরে এ ধারণা প্রচলিত ছিলো। তাদের কাছ থেকেই এ রকম কথা-বার্তা শুনে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিলো। কেননা, কলম্বাস কোন এক মুসলমানের শিষ্য ছিলেন। আর সেই মুসলমান ছিলেন হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর (রহ:) মুরীদ। মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ:) তাঁর কোন কোন স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের ভিত্তিতে তাঁর পুস্তকাদিতে লিখেছিলেন, স্পেনের সমুদ্রের অপর পাড়ে একটি বিরাট দেশ রয়েছে। আর যেহেতু মুসলমানদের মাঝে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ধারণা বদ্ধমূল ছিলো তাই মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবীর (রহ:) মুরীদ এ ধারণা পোষণ করছিলেন, সম্ভবত হিন্দুস্থানের দিকে তাঁর কাশ্‌ফ ইঙ্গিত করছে। এসব বর্ণনা শুনে কলম্বাসের হৃদয়ে আবেগের সঞ্চার হলো। তিনি সেই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানে গিয়ে পৌঁছবেন। কিন্তু যেহেতু এ সফরের জন্যে টাকা-পয়সার প্রয়োজন ছিলো। তার কাছে তখন টাকা-পয়সা ছিলো না। তাই তিনি রাজার কাছে পৌঁছলেন এবং এ প্রস্তাব পেশ করলেন। রাণীর কাছেও বড় বড় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সুপারিশ করে পাঠালেন যেন রাণী রাজার ওপর প্রভাব খাটান। রাণীর এ প্রস্তাবটি খুবই পছন্দ হলো। তিনি মনে করলেন, অভিযানে সফলতা লাভ করলে আমাদের দেশের অনেক কল্যাণ হবে। তাই তিনি রাজার কাছে সুপারিশও করলেন। কিন্তু যখন

রাজা সভাষদদের সাথে পরামর্শ করলেন তখন পোপের প্রতিনিধি এ ধারণাকে বড়ই হাসি-ঠাট্টার সাথে উড়িয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন, পৃথিবী গোলাকার এ ধারণা করা খুবই মূর্খতা, বরং ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। এরূপ মূর্খ ও বোকাকে টাকা-পয়সা দেয়া জ্ঞানের সাথে শত্রুতার শামেল। তিনি এক তেজস্বী বক্তৃতা দানের মাধ্যমে কলম্বাসের ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করলেন এবং বল্লেন, কলম্বাস নিজে পাগল বা আমাদের পাগল বানাতে চায়। পৃথিবী গোল হলে এবং হিন্দুস্থান আমাদের দেশের উল্টো দিকে হলে এর অর্থ তো এই দাঁড়ায়, পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের লোক তো বায়ুতে ঝুলে আছে। সুতরাং পৃথিবী গোলাকার, কলম্বাসের এ কথা বলায় সে আমাদের মানতে বাধ্য করতে চায়, পৃথিবীর একটি অংশ এমনও আছে যেখানে বসবাসকারী লোকদের পাগুলো ওপরের দিকে এবং মাথাগুলো নিচে। এ অংশে যে গাছ-পালা জন্মে এর মূলগুলো ওপরের দিকে এবং গাছগুলো শূন্যে ঝুলে আছে। আর সেখানে বৃষ্টি ওপর থেকে নিচে পড়ার পরিবর্তে নিচ থেকে ওপরের দিকে পড়ে। সূর্য পৃথিবীর ওপরে নয় বরং সে এলাকায় সূর্য পৃথিবীর নিচে পরিদৃষ্ট হয়।

মোটকথা সেই পাদ্রী তার নিজস্ব মূর্খতাপূর্ণ ধ্যান-ধারণাকে এমন রঙ্গে ও আমেজে বর্ণনা করলো, এতে জনগণের ধারণা এমন দৃঢ় হয়ে গেল যেন কলম্বাস আসলেই একজন ধোঁকাবাজ। আর দরবারের লোকেরা রাজাকে এ পরামর্শ দিলো, সেই লোকটাকে অবশ্যই সাহায্য করা উচিত নয়। কলম্বাসের সফর তাই এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেলো। পরিশেষে রাণী তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করান। পরে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। এতে স্পেনবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

মোটকথা এমন একটি যুগ ছিলো তখন পৃথিবী যে গোলাকার বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরা তা স্বীকার করতেন না। এ নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করতেন। কিন্তু আজ এ কথা শিশুকেও জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, পৃথিবী গোলাকার। আর এর প্রমাণ এই, যখন জাহাজ প্রথমে দেখা যায় তখন সবার আগে এর ওপরের অংশ দেখা যায়। এরপর আস্তে আস্তে নিচের অংশগুলো দৃশ্যমান হয়। এ রকম আরও কয়েকটি প্রমাণ দিতে পারে। মোটকথা এখন পৃথিবী এ বিশ্বাস ধারণ করে নিয়েছে এবং এ কথা পৃথিবীতে প্রচলিত হয়ে গেছে।

তাই কোন কোন বিষয় এমন আছে যা দুনিয়ার কাছে আস্তে আস্তে গৃহীত হতে থাকে। কখন কখন এমনও হয়, আগের কোন কোন বিষয় রহিত করে সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আবার কখন কখন এমনও হয় আগেরটিও মজুদ থাকে

এবং নতুনটি নিজস্ব স্থান সৃষ্টি করে নেয়। যেভাবে মোটর, লরী প্রভৃতির আগমনে ঘোড়াও আছে। কিন্তু মোটর ও লরীও এদের স্থান করে নিয়েছে।

প্রথম প্রথম যখন রেলগাড়ীর প্রচলন হলো তখন ইংল্যান্ডের লোকেরা রেলের সামনে যেত এবং বলতো আমরা মরে যাবো তবুও একে চলতে দেবো না। পরিশেষে রেল দুনিয়াতে প্রচলিত হয়েই গেলো। মক্কায় যখন টেলিফোন স্থাপন করা হলো তখন আরবী লোকেরা বলতে লাগলো, এটা শয়তান। মক্কায় এ শয়তানকে আমদানী করা হয়েছে। ইবনে সউদের এত বিরোধিতা হলো যে, তার সৈন্য বাহিনীও বিদ্রোহ করার উপক্রম হলো। পরিশেষে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিভাবে শয়তান হয়ে গেলো? তারা বল্লো, শয়তান নয় তো কী? জেদ্দা থেকে এক ব্যক্তি কথা বলে আর তা মক্কায় পৌঁছে যায়। এটা কেবল শয়তানের প্রতারণার কলা-কৌশল। তিনি খুবই বিচলিত হলেন। এখন কী করি? শেষে এক ব্যক্তি বল্লো, আমি তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং টেলিফোনের একদিকে আরবের এক নেতাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো, যে বলতো শয়তান কথা বলে। আর অন্য দিকে সে নিজে দাঁড়িয়ে গেলো। সে জিজ্ঞেস করলো, বল তো হাদীসে কি এসেছে 'লা হাওলা' পড়লে শয়তান পালিয়ে যায়? সে বল্লো, হ্যাঁ, এসেছে। আবার সে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা যদি কেউ হাদীস অস্বীকার করে, সে কী? সে বল্লো, কাফির। সে বল্লো, আচ্ছা শোন! আমি 'লা হাওলা' পড়ছি। এই বলে তিনি 'লা হাওলা' পড়লেন। সেই আপত্তিকারী মৌলবীকে বল্লেন, এখন বলো শয়তান এ 'লা হাওলা' অন্য দিকে পৌঁছাচ্ছে কি? শয়তানের কি শক্তি যে, সে 'লা হাওলা' পৌঁছায়। সেই আপত্তিকারীর তখন বোধগম্য হলো। সে লোকদের বুঝিয়ে দিলো এ শয়তান নয় বরং অন্য কিছু।

মোটকথা দুনিয়াতে কোন আন্দোলন শুরু হলে লোকেরা এর বিরোধিতা শুরু করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর পূর্বের ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব স্থানও দখল করে নেয়। কিন্তু এমন কোন কোন আন্দোলনেরও উদ্ভব হয় যা পূর্বতন ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি বদলিয়ে দেয়। আর তা মৈত্রী স্থাপন করে পূর্বতন ব্যবস্থাপনার অংশে রূপান্তরিত হয় না বরং একটি নতুন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে। পূর্বতন ব্যবস্থাপনা বা ব্যবস্থাপনাগুলো ভেঙ্গে দেয়। এর জন্যে সংগ্রাম করা হয়। এর জন্যে যুদ্ধ করা হয় (হোকনা তা দৈহিক রঙ্গে বা আধ্যাত্মিক রঙ্গে)। আর এ রকম মনে হয় যে, এজন্যে দুনিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হয়ে যায়। পরিশেষে এসব যুদ্ধ-বিবাদের পর তা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে দুনিয়াতে আবার শান্তির হাওয়া বইতে থাকে। মক্কা মোকাররমায় টেলিফোন স্থাপনের ঘটনার সদৃশ আমাকে নওয়াব আকবর ইয়ার

জং বাহাদুর সাহেবও বলেছেন, হায়দারাবাদের মসজিদে লাউডস্পিকার লাগানো হলো। তখন লোকেরা কুফরী ফতওয়া দিয়ে দিলো। আমাদের এখানে কাল মেয়েদের জলসাগাহেও লাউডস্পিকারের ওপরও ফতওয়া লেগে গিয়েছিলো। কোন কোন মহিলা মঞ্চের কাছে আসতে চাচ্ছিলো। এর ওপর জলসার ব্যবস্থাপকগণ তাদের বল্লেন, কাছে আসার কী প্রয়োজন? এই যে যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে এতে প্রত্যেক স্থানেই কথা পৌঁছে যাবে। এর ওপর তারা বলতে লাগলো– সানু তুহাড্ডে ফেরেবদা পাত্তা নেহী, আসিঁ এইডিয়াঁ ঈ-বেউকুফ হাঁ, ভালা ইয়ে ধূতু বোলেগা? অর্থাৎ আমরা কি তোমাদের চালাকি বুঝি না। আমরা কি এতটাই বোকা যে এটা মনে করবো, এ টিনের টুকরা কথা বলবে? এটা কথা বলতে পারে না। কেবল নিজেদের পরিচিত মহিলাদের সামনে বসানোর জন্যে এটা একটি বাহানা বানানো হয়েছে মাত্র।

বন্ধুগণের উচিত তারা যেন ঘরে গিয়ে নিজেদের স্ত্রীগণকে বুঝিয়ে দেন, এ টিনের টুকরা বেশ কথা বলতে পারে। কাল মহিলারা বেশ কুস্তি লড়েছেন। কোন কোন মহিলা তো পাহারাদারগণকে ফেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছেন এবং বলেছেন, আমরা এ চালাকীর শিকার হতে পারি না। তারা যেন তাদের বুঝিয়ে দেন এটা আমাদের চালাকী নয় বরং ইউরোপবাসীদের কল্যাণপ্রদ চালাকী। এ দিয়ে আসলে কথা দূরে পৌঁছে যায়।

মোটকথা সংশোধনের দুটো পদ্ধতি আছে। মৈত্রী অথবা যুদ্ধ। অর্থাৎ নতুন আন্দোলনকে হয় পুরানো আন্দোলনের মাঝে আত্মস্থ করে বা মিলিয়ে একটি নতুন জিনিস তৈরী করা হয় এবং দুটো আন্দোলন একটিতে রূপান্তরিত হয়ে থেকে যায় অথবা অন্যভাবে নতুন ও পুরনো আন্দোলনের মাঝে বিবাদ-বিসম্বাদের পর নতুন আন্দোলন পুরনোকে উঠিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে দেয় এবং এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। প্রথম প্রকারের সংশোধনকে বলে বিবর্তন অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। লোকেরা এটা উপলব্ধিও করতে পারে না। কিন্তু অন্য প্রকারের আন্দোলনে সংগ্রাম করতে হয়। একে আরবী ভাষায় **ইনকিলাব** অর্থাৎ বিপ্লব বলে। যেভাবে পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু সাহেবের সভাতে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ– (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক)। এটাও সেই বিপ্লব আর এর অর্থ হলো, প্রতিষ্ঠিত সরকারের সাথে কংগ্রেসের এতই মতেভেদ যে, তারা একে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে-চুরে একটি নতুন সরকার গঠন করবে এবং তারা মধ্যম কোন পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত নয়। যদিও কংগ্রেস বাস্তব ক্ষেত্রে সব কিছু মেনে নিয়েছে এবং কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রীসভাও গঠন করে নিয়েছে। এখন কেবল অভ্যেসবশত 'ইনকিলাব

জিন্দাবাদ' এর ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছে। যেভাবে তোতা পাখীর 'মিয়াঁ মিঠু' বলার অভ্যেস হয়ে থাকে। নচেৎ কংগ্রেসের জন্যে ইনকিলাবের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

'ইনকিলাব' অর্থ

যাই হোক 'ইনকিলাব' অর্থ হলো, প্রচলিত ব্যাবস্থাকে সংশোধন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে না, বরং এ ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। আর এর জায়গায় একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

'ইনকিলাব'-এর অপর নামগুলো

এ ইনকিলাব বা বিপ্লব যখন ধর্মীয় কারণে হয় তখন ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী একে **কিয়ামত** বা পুনরুত্থানও বলা হয়। আর এর অপর নাম **খালকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরয** বা নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর সৃষ্টিও বুঝায়। এর অন্য একটি নাম **আস্‌সায়াত** বা নির্দিষ্ট সময়ও হয়। যেমন, কুরআন করীমে আধ্যাত্মিক বিপ্লবকে **কিয়ামত** বলা হয়েছে। কখনো **আস্‌সাআত** বা নির্দিষ্ট সময় হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করা'র কথা বলে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

দুনিয়াতে যত প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অথবা সফল আন্দোলনসমূহ সংঘটিত হয়েছে তা সেই রঙ্গেই হয়েছে। কোন বিশ্বজোড়া আন্দোলন এবং দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী আন্দোলন এমন নেই যাতে দুনিয়ার জন্যে নতুন আহ্বান নেই এবং যাতে বিপ্লব নেই। বিবর্তনমূলক আন্দোলনসমূহ মহান আন্দোলনের মাধ্যমে সংঘটিত হয় না। দুনিয়াতে যখনই মহান আন্দোলনসমূহ সাধিত হয়েছে বিপ্লবের মাধ্যমেই হয়েছে। আর এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হলে আমরা কংগ্রেসের চেয়েও অধিক জোরেশোরে বলতে পারি, **ইনকিলাব জিন্দাবাদ**। কিন্তু এতে আমাদের উদ্দেশ্য অন্য রকম হবে। এ শব্দে তাদের উদ্দেশ্য অন্য রকম হয়ে থাকে।

পার্থিব পাঁচটি মহান আন্দোলন

দুনিয়ার বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হলে পার্থিব বিজয়ের দিক থেকেও সেসব সরকার দুনিয়াতে দীর্ঘ কাল যাবৎ স্থায়ী রয়েছে এবং এর প্রভাব ব্যাপকতর হয়েছে যাতে কোন না কোন আহ্বান ও বিপ্লব নিহিত ছিলো। অর্থাৎ পূর্বতন ব্যবস্থাপনা থেকে ভিন্নতর অস্তিত্বের অধিকারী ছিলো। এ রকম আন্দোলন পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটিই অতীত হয়ে গেছে। যেমন, এদের মাঝে একটি

আন্দোলন হিন্দুস্থানে উত্থিত হয়েছিলো। একে আর্য সভ্যতা বলে। অর্থাৎ আর্যদের অভ্যুত্থান। এ আন্দোলন কেবল হিন্দুস্থানেই সীমাবদ্ধ ছিলো। অপর একটি আন্দোলন পাশ্চাত্যে উত্থিত হয়েছিলো। এ হলো রোমান সভ্যতা। তৃতীয় আন্দোলন মধ্য এশিয়া ও চীনে জন্ম নিয়েছিলো। এর নাম আমি পারশ্য সভ্যতা রাখলাম। চতুর্থ আন্দোলন পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় জন্ম নিয়েছিলো। এর নাম আমি বেবিলনীয় সভ্যতা রাখলাম। আর পঞ্চম আন্দোলন বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে এ হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা।

বিশ্বের জ্ঞাত ঐতিহাসিক যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, এ পাঁচটি আন্দোলন বা সভ্যতা বস্তুবাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে খুবই জাঁকজমকের সাথে এবং আন্তর্জাতিক সভ্যতা হিসেবে অতীত হয়ে গেছে। অর্থাৎ আর্য সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, পারশ্য সভ্যতা, বেবিলনীয় সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা। এ পাঁচটি সভ্যতার পিছনেই এক নতুন দর্শন কার্যকরী ছিলো। আর এতে ছিলো নতুন সংস্কৃতি। কোন কোন জাতি তরবারী ধারণ করলো আর কয়েকটি দেশ বিজয় করে ফেল্ল কেবল এটাই নয়। বরং সেসব আন্দোলন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করলো বা নব-জ্ঞানের অর্গল উম্মোচন করলো। আর যদিও সেসব নব-সভ্যতার ধারক ও বাহকরা কিছু দিনের মাঝে রাজনৈতিকভাবে শাসন ক্ষমতা হাড়িয়ে ফেল্ল এবং তাদের জায়গায় অন্যান্য জাতিবর্গ আবির্ভূত হলো। কিন্তু তাদের পরাভূতকারী ও ধ্বংসকারী জাতির লোকেরা তাদের ধ্যান-ধারণা এ দর্শনাদি থেকে মুক্তি পেতে পারলো না। রাজনৈতিক দাসত্ব যদিও দূরীভূত হতে থাকলো কিন্তু মেধাগত ও জ্ঞান-বুদ্ধিগত দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলো। প্রকৃতপক্ষে আসল কর্তৃত্ব তাদের হাতেই রয়ে গেলো। এরূপ বিজয় ও সফলতাকে নব-আহ্বান বা বিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা যায়। বাহ্যত এরিরান বা আর্য সভ্যতা এবং প্রাচীন ইরানী বা পারশ্য সভ্যতা, রোমান ও ব্যবিলনীয় কর্তৃত্ব কিছুকালের মাঝে দুনিয়া থেকে মিটে গেল। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, এদের মাঝে থেকে কোন কোনটি কোন না কোন রঙ্গে এখনও দুনিয়াতে মজুদ আছে। আর বাহ্যত এদের সাথে ঘৃণা ভাব পোষণকারী লোকও প্রকৃতপক্ষে তাদের দাসত্বের শৃঙ্খল স্কন্ধে ধারণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের পরে আগমনকারী শাসকরাও প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্মকাণ্ড পরিবর্তন করার একটি বাহ্যিক মহড়া দেখালেন মাত্র। নচেৎ সরকারী নীতি নির্ধারক তারাই যারা সেই বিখ্যাত সভ্যতার প্রবক্তা ছিলেন। বিদ্রোহ ছিলো সেই সভ্যতা-সংস্কৃতির শেষ যুগের নেতার বিরুদ্ধে, সেই সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ছিলো না। পরিবর্তন কেবল এটাই ছিলো। সেই সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পতাকা এক হাত থেকে অন্য হাতে পরিবর্তিত হলো। কখনো কখনো পতাকার রং সামান্য পরিবর্তন করে দেয়া হলো। কখনো পতাকা অধিক লম্বা বা খাটো করে দেয়া হলো। কিন্তু আসল বস্তু তা-ই থাকলো যা পূর্বে ছিলো।

পাশ্চাত্যে রোমান সাম্রাজ্যের পরে যে পরিবর্তন সাধিত হলো, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে, তা রোমান সভ্যতারই একটি পরিবর্তিত রূপ। আর পারশ্য সভ্যতার প্রবক্তাদের পরবর্তী সরকারের মাঝে সুস্পষ্টভাবে প্রাথমিক পারশ্য সভ্যতার ঝলক পরিলক্ষিত হয়। আর্য সভ্যতার প্রবক্তাদের পরে বুদ্ধ, জৈন প্রভৃতি কয়েক প্রকারের লোক শাসন কার্য পরিচালনা করে। কিন্তু আর্য ছাপ সবার আঁচলে বিরাজমান ছিলো। বেবিলনের শাসকদের পরে আরব, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে বহু শাসকের পরিবর্তন হয়েছে। কত বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু বেবিলনীয় প্রভাব মুছে যাওয়ারও ছিলো না মিটেও যায়ওনি।

এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা সারা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে আছে। এশিয়া এবং আফ্রিকা এর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। এর আগে আমেরিকার উভয় মহাদেশ সফলকাম হওয়ার চেষ্টা করেছে। জাপান এশিয়ার এক প্রান্তে আর তুর্কিস্তান অপর প্রান্তে সফলতার সাথে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফল কি দাঁড়ালো? কেবল শাসক বদলিয়েছে শাসন বদলায় নি। বরং তুর্কিস্তান ও জাপান স্বাধীনতার পরে আগের চেয়েও পাশ্চাত্যের অধিক শিকার হয়েছে।

আজ হিন্দুস্তান স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করছে। এর যুবকবৃন্দ প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে যেন নিজেদের দেশকে বিদেশী শাসকদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সেই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যেন ইংল্যান্ডের পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থলে ভারতীয় পাশ্চাত্য সভ্যতা স্থান করে নেয়। এথেকে অধিক এ সংগ্রামের কোন উদ্দেশ্য নেই। মি: গান্ধি খদ্দরের পোষাক পরিধান করে সেই বিষয়কে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যেন তিনি সেই সভ্যতার কবল থেকে মুক্তি পেতে চান। কিন্তু যারা জানার তারা সঠিকভাবে জানেন ঢং সেটাই কেবল স্কটল্যাণ্ডের ওয়ার ষ্টেড (এক প্রকার উন্নত মানের উলের কাপড়)-এর স্থলে তাকে খদ্দরের পোষাক পরিয়ে দিয়ে গেছে। অথবা মসীহ নাসেরী (আ:)-এর কথামত 'পুরাতন মদ নতুন বোতলে' ঢেলে দিয়ে গেছে। এথেকে অধিক আর কোন পরিবর্তন হয় নি।

এখন আমি এ পাঁচটি সভ্যতার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করছি যেন এ পাঁচটি সভ্যতার প্রবাহ বিশ্বের জন্যে কী বাণী বয়ে নিয়ে এসেছিলো তা লোকেরা বুঝে। আর কী কল্যাণমণ্ডিত জিনিষ তারা বিশ্বকে উপহার দিয়েছিলো যাথেকে তারা হাজার হাজার বছরের সংগ্রামের পরেও মুক্তি লাভ করতে পারে নি।

আর্য সভ্যতার বাণী– বর্ণগত বৈশিষ্ট্য

স্মরণ রাখা দরকার, আর্য সভ্যতার ভিত্তি Eugenic (সুপ্রজনন সংক্রান্ত)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ তাদের সব কিছুর ভিত্তি এ কথার ওপর রচিত ছিলো যে, সব মানুষ এক নয়। বরং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ রয়েছে। কেউ উঁচু হয় তো কেউ আবার নিচু। যেভাবে কেউ ধনী হলে কেউবা হয় গরীব। কেউ শক্তিশালী হলে কেউ হয় দুর্বল। কেউ উত্তম মেধার অধিকারী হলে কেউ কম মেধার অধিকারী হয়ে থাকে। এ ভেদাভেদকে বিশেষ অবস্থার মাধ্যমে স্থায়ী করা যেতে পারে। এটাও এর ভিত্তি ছিল। মানুষের মাঝে যে সবচে' উচ্চ-উন্নত তাকে সামনে নিয়ে আস যেন মানুষের প্রজন্ম উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে যেতে পারে। বিশ্বের কল্যাণ এর মাঝেই নিহিত।

তারা একথা বলেন, একজন শক্তিশালী পিতার পুত্র অবশ্যই শক্তিশালী হবে। আর দুর্বল পিতার সন্তান হবে দুর্বল। এখন পিতার কারণে সুঠাম দেহ সৃষ্টি হতে পারলে মেধা যে উন্নত সৃষ্টি হবে না এমন কি কারণ আছে? তাই যদি উত্তম মেধাসম্পন্ন পিতা হয় এবং উত্তম মেধাসম্পন্ন মাতা হয় তাহলে তাদের সন্তানও অবশ্যিই উত্তম মেধাসম্পন্ন হবে। এ অবস্থায় সেই ব্যক্তির মাধ্যমে প্রজন্ম সৃষ্টি হতে থাকলে এবং তারা নিজেদের জাতির মাঝেই বিয়ে-সাদী করতে থাকলে সেই জাতি অন্যান্য জাতি থেকে অবশ্যই উন্নত হবে।

এ আর্য সভ্যতা যেখানেই বিস্তার লাভ করেছে তারা নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা এ ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠা করেছে। অর্থাৎ বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর যা বুদ্ধিভিত্তিক মেধাভিত্তিক ও ধর্মভিত্তিক সীমাসমূহ পরিবেষ্টিত ছিলো। যেমন তারা বলে, ব্রাহ্মণের ছেলে জ্ঞানের দিক থেকে সব সময় অন্যদের ওপর বুৎপত্তি লাভ করবে। একজন ক্ষত্রিয়ের ছেলে যুদ্ধ বিদ্যার দিক থেকে অন্যদের ওপর পারদর্শিতা লাভ করবে। আর যখন বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি জাতির উন্নতি লাভ হবে তখন তারা নিজেদের মাঝেই বিয়ে-সাদী করবে। এমতাবস্থায় সেই জাতি কখনো দুনিয়া থেকে বিনাশপ্রাপ্ত হতে পারে না। এজন্যে তাদের ধর্মও সেই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রবহমান থাকে। যেমন বেদ অবতীর্ণ হলো। বেদের মাঝে এ আদেশ প্রদান করা হয়েছে শূদ্র যদি বেদ শুনেও ফেলে তাহলে তার কানে শিসা গলিয়ে ঢেলে দাও। এটা (পাঠ করা ও শুনা) ব্রাহ্মণের অধিকার অথবা ক্ষৈত্রিয় ও বৈশ্যদের বেদ শ্রবণ করার অধিকার রয়েছে। শূদ্রদের কী অধিকার যে তারা বেদ শ্রবণ করে? মোটকথা ধর্মও এ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

আবার তারা এই যে বলে, মরণের পরে মানুষ পুনরায় এ পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং তাকে বিভিন্ন যোনীতে নিক্ষেপ করা হয়। যতটা আমি অভিনিবেশ সহকারে দেখেছি, এতে আমি মনে করি এ ধর্মীয় বিশ্বাসও সেই দর্শনের ফলস্বরূপ।

কেননা, তারা মনে করে উন্নত মানের প্রজন্ম সৃষ্টি করার জন্যে উন্নতমানের আত্মা এতে সংযোজিত থাকা দরকার। আর এর জন্যে পদ্ধতি তারা প্রস্তাব করেছে, প্রত্যেক জাতিতে যে উন্নত ও পবিত্র আত্মাগুলো রয়েছে মরণের পরে ওগুলো যেন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেয়। যারা যোদ্ধাসুলভ শক্তি রাখে তারা ক্ষত্রিয়ের ঘরে এবং যারা ব্যবসায়ীসুলভ দক্ষতা রাখে তারা বৈশ্যদের ঘরে জন্ম নেয়। এ বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা নিম্ন বর্ণের লোকদের বিদ্রোহের অবকাশকে দূরীভূত করে দিয়েছে। কেননা, শূদ্রদের যদি বলা হয় তোমরা সব সময়ের জন্যে শূদ্রই থাকবে তাহলে তাদের বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা থাকতো। অথবা ক্ষত্রিয়দের যদি বলা হতো তোমাদের কাজ কেবল প্রাণ বিসর্জন দেয়া তাহলে তারা ব্রাহ্মণ-শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত। সুতরাং এ ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের স্তব্ধ করানো হয়েছে যেন তারা ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ঠান্ডা মাথায় স্বীকার করে নেয়। কেননা, তাদের এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য অথবা শূদ্র একই বংশ থেকে উদ্ভুত নয়। বরং এগুলো তো পদ-মর্যাদা। উত্তম বা নিকৃষ্ট আত্মা হওয়ার কারণে এগুলো লাভ হয়ে থাকে। এখন যেভাবে এক রিসালদারের বিরুদ্ধে এক জমাদ্দারের, এক লেফটেন্যান্টের বিরুদ্ধে এক রিসালদারের অভিযোগ থাকতে পারে না। কেননা, তারা অবহিত দক্ষতার কারণে তাদের এ পদ লাভ হয়েছে এবং আমি যখন সেই দক্ষতা অর্জন করতে পারবো তখন আমারও এ পদ লাভ হবে। এভাবে এক শূদ্রের এক বৈশ্যের, এক বৈশ্যের এক ক্ষৈত্রিয়ের এবং এক ক্ষত্রিয়ের এক ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে না। কেননা, এ জন্ম তো বিগত জন্মের কর্মের প্রতিফলে লাভ হয়েছে। একজন শূদ্র সৎকর্ম করলে পরজন্মে সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম লাভ করবে এবং এক অসৎ ব্রাহ্মণ শূদ্রের ঘরে জন্ম নিবে।

এমনিভাবে প্রাধান্যকে চিরস্থায়ী রেখেও আর্য সভ্যতার প্রবক্তাগণ এ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে মিটিয়ে দিয়েছে। আর আশার কুহক অন্য সম্প্রদায়ের মাঝে এমনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যেন তারা এ খেলনা নিয়ে খেলায় মশগুল থাকে এবং তাদের সত্যিকারের দু:খ-বেদনা একেবারে ভুলে যায়। এ কারণেই বর্ণ ভেদের নির্মম নিষ্পেষণ চরম পর্যায়ে বৃদ্ধি পাওয়ার পরও হাজার হাজার বছর ধরে নিম্ন শ্রেণীর জাতিগুলো তাদের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট। কেননা, প্রত্যেক শূদ্রের দৃষ্টিতে পুনর্জন্ম তার প্রজন্মের হেয়তার যুগ কেবল তার বর্তমান জন্মের যুগের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং প্রত্যেক শূদ্রের প্রাণে বর্তমান ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধারণা সৃষ্টি হলে এটা মনে করে চুপ হয়ে যায়, আমি এ জন্মে আমার পাপের কারণে এসেছি অন্যথায় এর আগে আমিও হয়ত ব্রাহ্মণই ছিলাম। আর এখনও ব্রাহ্মণদের খুশী করে সম্ভবত পরজন্মে

আমিও ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেব। অতএব যে মর্যাদা লাভের হাতছানি আমাকে ডাকছে আমি নিজের হাতে সেই মর্যাদার হানি ঘটিয়ে কেন ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনাকে নসাৎ করে দেব?

আসল কথা এই, বর্ণগত প্রাধান্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে পুনর্জন্মের ধ্যান-ধারণার উদ্ভব এক উন্নত মেধার বিস্ময়কর ফসল। এর কারণে কোটি কোটি মানব-সন্তানকে হাজার হাজার বছর ধরে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে দেয়া না হলে একে অবশ্যই বাহবা দেয়া যেত!

রোমান সভ্যতার ভিত্তি আইন ও মানবাধিকারের ওপর

রোমান সভ্যতার ভিত্তি আইন-কানুন এবং মানবাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন এ সভ্যতার প্রবক্তাগণ প্রথম মানুষের অধিকারের কথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এমনভাবে ভিত্তি স্থাপন করেছে যে, কাউকে কোন শাস্তি দিতে হলে আইনের মাধ্যমে দেয়া হোক। এভাবে তারা রাজনীতিকে আইনের অধীন নিয়ে আসে। আর তারা এমন নীতি নির্ধারণ করে যা দিয়ে একটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের ওপর শাসন কার্য চালানো যায়। এ কারণে এখনও রোমান ল' (Roman Law) পাশ্চাত্য জগতে পাঠ করানো হয়। আর এ নীতির ভিত্তিতে এখনও আইন বিশারদগণ উপকৃত হয়ে থাকেন।

পারশ্য সভ্যতার আহ্বান– উত্তম আচরণ ও রাজনীতি

পারশ্য সভ্যতার ভিত্তি আচরণ ও রাজনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্যে তাদের মাঝে খোদা তাআলার প্রসঙ্গেও একথা বলা হয়, পাপের মত খারাপ জিনিস সৃষ্টি যেহেতু খোদা তাআলার জন্যে সম্ভব নয় তাই প্রকৃতপক্ষে খোদা দুজন। একজন পুণ্যের এবং অপর জন পাপের। মোটকথা উত্তম আচরণকে তারা এতখানি মর্যাদা দিয়েছে যে, অন্যায় আচরণজনিত বিষয়গুলোর স্রষ্টা আল্লাহ্‌র দিকে আরোপ করা হোক তাদের জন্যে এ বিষয়টি স্বীকার করার অযোগ্য হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু পাপ দুনিয়াতে মজুদ ছিলো তাই তারা এ দর্শনের উদ্ভাবন করেছে যে, পাপের সৃষ্টিকর্তা বলতে কোন খোদা থাকা উচিত যে উপাসনার যোগ্য নয় বরং ঘৃণার্হ।

পারশ্য সভ্যতার ভিত্তির দ্বিতীয় দর্শন ছিলো পরস্পর সহযোগিতার দর্শন। কারণ এই পারস্য সভ্যতাই প্রথম এ ধারণার ভিত্তি স্থাপন করেছিলো। একে সাম্রাজ্য

বা শাহানশাহ এর সত্তা বলা হয়। অর্থাৎ সবচেয়ে আগে এ ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষাকারী স্বাধীন শাসকবর্গের নীতি উদ্ভাবন করে এবং একে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাও দ্বৈতবাদের প্রতি বিশ্বাসের ফল হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে। তারা যখন এটা স্বীকার করে দুই খোদাই স্বাধীন। আবার একজন অপর থেকে শ্রেষ্ঠতরও তখন এর মাধ্যমে তারা দুনিয়াতেও এরূপ ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন করলো। একজন হোক বড় বাদশাহ এবং কতক হোক ছোট ছোট বাদশাহ যারা স্বাধীনও বটে। পরে আবার একজন উচ্চ ক্ষমতার অধীনও হোক। আর এ বিশ্বাস থেকে সর্বোচ্চ বাদশাহ্‌র ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করলো।

একজন শক্তিধর বাদশাহ্ একজন দুর্বল ও ছোট ধরনের বাদশাহ্‌র এজন্যে আনুগত্য করে যে, সে একজন দুর্বল বাদশাহ্। তার ওপর সর্বোচ্চ একজন বাদশাহ্ আছেন। হিন্দুস্তান বা অন্যান্য দেশে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এ কেবল পারস্য দর্শনের উদ্ভাবন। আর প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি নতুন পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে।

পারশ্যের ইতিহাসে কখনো কখনো এমন হয়েছে, প্রকৃত বাদশাহ্ দুর্বল হয়ে গেছে আর অধীনস্থ বাদশাহ্ অনেক শক্তিশালী হয়ে গেছে। কিন্তু সম্রাটের ডাকে সাহায্যের জন্যে সবাই উপস্থিত হয়ে গেছে। আজকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও আব্বাসীয়া খিলাফতের শেষ যুগ প্রকৃতপক্ষে এ দর্শনেরই প্রতিচ্ছবি। আর খিলাফতে আব্বাসীয়ার শেষ পর্যায়ের প্রতি আমরা মনোনিবেশ করলে এর সৃষ্টির ভিত্তি সেই বিষয়ের ওপর ছিল প্রকৃতপক্ষে তার অধীনস্থ রাজ্যগুলো পারশ্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বা পারশ্য সভ্যতার 'খয়ের খাঁ' ছিল। আর যেহেতু তাদের অমাত্যবর্গ বংশ পরম্পরায় সেই ধ্যান-ধারণা পোষণ করে আসছিলো তাই তারা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতের নামসর্বস্ব জোয়াল নিজেদের স্বন্ধে বহন করতো।

বেবিলনীয় সভ্যতার ভিত্তি জ্যামিতি ও জোতির্বিদ্যার ওপর ছিলো

চতুর্থ সভ্যতা হলো বেবিলনীয় সভ্যতা। এর ভিত্তি জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপর রাখা হয়েছিলো। এর প্রবক্তাদের ধারণা ছিলো, যেভাবে খোদা তাআলা চন্দ্র সূর্য ও তারকা সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে একটি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন মানুষের উন্নতি এ ব্যবস্থাপনার নকল বা অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভব।

এজন্যে আমাদের সৌর ব্যবস্থাপনার প্রতি মনোনিবেশ করে এবং এর রহস্য অনুধাবন করে এর অনুসরণ করা উচিত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আহ্বান হলো বস্তুবাদ ও জাতীয়তাবাদ

পঞ্চম সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হলো বস্তুবাদ ও জাতীয়তাবাদ।

পাঁচটি সভ্যতার ওপর আরও পর্যালোচনা

সংক্ষেপে পাঁচটি বস্তুবাদী সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করার পরে এখন আমি ওগুলোর মৌলিক নীতিসমূহের ফলাফলের ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

আর্য সভ্যতা যদিও বর্ণগত বৈশিষ্ট্য এবং ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো তথাপি অতি দীর্ঘ সময় ব্যাপী স্থায়ী থাকার পরও কখনো কোন সাম্রাজ্য প্রবর্তন করতে পারে নি। তদুপরি বর্ণবাদ প্রথার কারণে তাদের মাঝে সেই ঐক্যও সৃষ্টি হতে পারেনি। পারশ্যবাসীর মাঝে এটা পাওয়া যেত। এর মোকাবেলায় রোমান সাম্রাজ্য উন্নতি করে। কেননা, তাদের রাজনৈতিক রীতি-নীতি এমন ছিলো যে, জাতিসমূহ পরাভূত করার পরিবর্তে তারা তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতো। এজন্যে রোমান সভ্যতা স্থায়ী উন্নতির সিঁড়িসমূহ অতিক্রম করে চলতে থাকলো আর উন্নতির দর্শনের প্রবক্তায় পরিণত হলো।

পারশ্য সভ্যতা বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি রাখলো। অধীনস্থ ছোট ছোট রাজ্যগুলো নিজ নিজ সীমার মাঝে স্বাধীন ছিলো আবার একজন নেতার অধীনস্থও ছিলো। গোটা পারশ্য সাম্রাজ্যে এটা প্রচলিত ছিলো। এই শাসকের ওপর শাসকের অনুভূতি তাদের মাঝে আহেরমান (অগ্নি উপাসকদের মন্দের খোদা) ও ইয়াযদান (অগ্নি উপাসকদের কল্যাণের খোদা)-এর ধারণা সৃষ্টি করেছে।

বেবিলনীয় সভ্যতা রসায়ন ও জ্যামিতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর কারণে নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিলো। যদিও এ সভ্যতা সবচেয়ে প্রাচীন। এর নিদর্শনাবলী কমই পাওয়া যায়। কিন্তু এর যেসব নিদর্শনাবলী পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর।

কুরআন করীমে বেবিলনীয় সভ্যতার নিদর্শনাবলী

কুরআন করীমেও এ সভ্যতার কোন কোন শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। সূরা ফজরে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **আলাম তারা কায়ফা ফা'আলা রব্বুকা বি 'আদিন-ইরামা যাতিল 'ইমাদিল্লাতি লাম ইউখলাক মিসলুহা ফিল বিলাদ-**

ওয়া সামূদাল্লাযীনা জাবুস্‌সাখরা বিলওয়াদ-ওয়া ফির'আউনা যিল আওতাদ-আল্লাযীনা তাগাও ফিল বিলাদ-ফা আকসারু ফীহাল ফাসাদ ।

অর্থাৎ তুমি কি দেখনি, তোমার প্রভু প্রতিপালক আদ জাতির সাথে কী ব্যবহার করেছেন– বড় বড় অট্টালিকার অধিকারী ইরাম (গোত্র)-এর সাথে? তাদের সমতুল্য কোন জাতি এসব দেশে সৃষ্টি করা হয়নি । আর সামূদের সাথে যারা উপত্যকাসমূহে (ঘর তৈরীর জন্যে) পাথর কাটতো এবং ফেরাউনের সাথে যে উঁচু উঁচু অট্টালিকার অধিকারী, যারা দেশে বিদ্রোহ করেছিলো আর এতে উপদ্রব বাড়িয়েছিলো? (সূরা ফজরঃ ৭-১৩) ।

এ সভ্যতার ভিত্তি যেসব লোক রেখেছিলো তাদের 'আদ 'জাতি বলা হয় । 'আদ' নামে দুটি জাতি অতীত হয়ে গেছে । প্রথম 'আদ' জাতি বেবিলনীয় সভ্যতার প্রবক্তা । আর অন্য 'আদ' জাতি পরবর্তী যুগে এ সভ্যতার ধারক ও বাহকদের মাঝে অন্যতম । এ আয়াতে সেই প্রাথমিক 'আদ' জাতি অর্থাৎ বেবিলনীয় সভ্যতার প্রবক্তাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে । আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'তোমার কি জানা নেই আল্লাহ্ তাআলা 'আদ' জাতির সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন? সেই 'আদ' যাদের 'আদে ইরাম' বলা হয় । তারা বড় বড় উঁচু উঁচু অট্টালিকা তৈরী করতো । এত বড় উঁচু অট্টালিকা তৈরী করতো যে, **লাম ইউখলাক মিসলুহা ফিল বিলাদ**– তাদের পরের কোন জাতিই এ কৌশলের ক্ষেত্রে তাদের মোকাবেলা করতে পারে নি । অর্থাৎ যদিও সাধারণভাবে দুনিয়া উন্নতি করছে কিন্তু কুরআন করীমের যুগ পর্যন্ত উন্নতি সত্ত্বেও কোন জাতি অট্টালিকার নির্মাণ কৌশলে তাদের মোকাবেলায় উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি ।

ওয়া সামূদাল্লাযীনা জাবুস্‌সাখরা বিল ওয়াদ-আবার এ 'আদ'-এরই অন্য আর একটি শাখা হলো 'সামূদ' । এরা পাথর খোদাই কাজে উৎকর্ষ লাভ করেছিলো এবং শহরের পর শহরে পাহাড়ের কন্দর তৈরী করে যাচ্ছিলো । **ওয়া ফিরআওনা যিল আওতাদ**– আর মিশরের ফিরাউনও সেই সভ্যতারই বাহক ছিলো । সে-ও **যিল আওতাদ** । কোন কোন লোক 'আওতাদ'-এর অর্থ তাঁবুর কীলক বা খুটা করেছেন । কিন্তু এখানে এ অর্থ ঠিক নয় । এখানে 'আওতাদ'-এর অর্থ সেসব উঁচু উঁচু অট্টালিকা যেগুলো পাহাড়ের ন্যায় উঁচুতে দেখা যায় । আরবীতে পাহাড়কেও **আওতাদুল আরয** বলা হয় । আবার মানুষের নাককেও **ওয়াতাদ** বলা হয় । কেননা, এটা মুখমন্ডলের অন্যান্য অংশ থেকে উঁচুতে দেখা যায় । এই মিশরীয় অট্টালিকাসমূহের বৈশিষ্ট্য এই, তারা অট্টালিকাগুলোকে পাহাড়ের ন্যায় ত্রিভূজাকৃতিবিশিষ্ট বানিয়ে থাকে এবং বসবাসের দিকে খেয়াল

রাখে না বরং উচ্চতার দিকে খেয়াল রাখে। অতএব **যিল আওতাদ**-এর অর্থ কেবল উঁচু অট্টালিকার অধিকারী করেছেন।

যারই মিশর যাওয়ার সুযোগ হয়েছে তিনি জানেন মিশরের পিরামিড কত উঁচু। দূর দূর থেকে লোকেরা এসব দেখতে আসে আর তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়, এত উঁচুতে লোকেরা কিভাবে পাথর উঠিয়েছে! পিরামিড এত উঁচু যে, এর ওপর উঠতে মানুষের অনেক সময় লেগে যায়। আমার আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এর ওপর উঠতে পারিনি। বরং এক বন্ধুর একটি পিরামিডের ওপর উঠতে এত সময় লেগে গিয়েছিলো যে, আমার ভয় হয়েছিল আমরা রাতের আঁধারে কিভাবে আবার বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিবো। এর উচ্চতার তুলনায় কুতুব মিনারের উচ্চতার কোন তুলনাই হয় না। ইউরোপের লোকেরাও এগুলো দেখে স্তম্ভিত হয়। আর মানুষের সমান সমান আকৃতির পাথর তারা এত উঁচুতে কিভাবে উঠিয়ে নিয়ে গেছে তা তাদের বোধগম্য হয় না।

তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন– তোমরা ফিরাউনকে দেখো, যে এমন ত্রিভূজাকৃতি দৃষ্টান্তবিহীন অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ করতো। এগুলো ছিলো খুবই উঁচু আর মজবুত। আরও বলেছেন– এ সভ্যতার বাহকগণ নিজ নিজ উন্নতির যুগে দুনিয়াতে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। আর তাদের বাহু বলের কারণে তারা ভীষণ আত্মম্ভরী হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু দেখো, আমরাও তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলাম এবং কিভাবে তাদের বিনাশ করে রেখে দিয়েছি।

মোটকথা বেবিলনীয় সভ্যতার যুগে লোকেরা অট্টলিকাসমূহ নির্মাণে ও মান-মন্দির তৈরীতে অধিক আগ্রহী ছিলো। তাদের ধ্বংসাবশেষের মাঝে সব জায়গায় বিরাট বিরাট অট্টালিকা দেখা যায়। প্রথমে ইউরোপের লোকেরা 'আদ' জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করছিলো আর বলছিলো 'আদ' নামের কোন জাতি ছিলো না। কিন্তু বিশ বছর থেকে অর্থাৎ যখন থেকে 'আদ 'সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল তখন থেকে তারা বলে আসছে 'আদ' নামের একটি জাতির অস্তিত্ব ছিলো। বরং সাম্প্রতিককালে আমি এক খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকের পুস্তক পড়েছি। এতে তিনি 'আদ' জাতির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'আদ' জাতির ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকগুলোতে তা থেকে অধিক জ্ঞান বর্ণনা করতে পারে নি যা কুরআন করীম নিজ কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করে দিয়েছে (তারীখুল আরব কাবলুল ইসলাম : প্রণেতা, জর্জি যায়দান)।

পবিত্র গ্রন্থসমূহে বেবিলনীয় সভ্যতার উল্লেখ

বেবিলনীয় রাজত্ব প্রসঙ্গে তওরাতে যে বর্ণনা এসেছে এতেও কুরআনের বর্ণনার সত্যায়ন হয়। যেমন বাইবেলে এসেছে– 'পরে তাহারা কহিল, আইস, আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগনস্পর্শ এক উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, পাছে সমস্ত ভূমন্ডলে ছিন্ন ভিন্ন হই। পরে মনুষ্য সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া সদা প্রভু নামিয়া আসিলেন। আর সদা প্রভু কহিলেন, দেখ তাহারা সকলে এক জাতি ও এক ভাববাদী, এখন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ইহার পরে যে কিছু করিতে সংকল্প, করিবে তাহা হইতে নিবারিত হইবে না। আইস, আমরা নীচে গিয়া, সেই স্থানে তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই, যেন তাহারা একে অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে' (আদি পুস্তক: ১১ : ৪-৭)।

এ উদ্ধৃতি থেকে এটা বুঝা যায়, ইহুদী ইতিহাস অনুযায়ীও অট্টালিকা নির্মাণ বেবিলনীয় লোকদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। কেননা, তওরাতের এ উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট, দুনিয়াতে ভাষার বিভেদের কারণ এই, কোন সময় বেবিলনের লোকেরা এক উঁচু অট্টালিকা তৈরী করা আরম্ভ করলো যেন এটা তাদের জন্য নিদর্শনে পরিণত হয় এবং এজন্যে তারা বিক্ষিপ্ততা থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিক্ষিপ্ত করতে চাইলেন। এজন্যে তিনি তাদের এ আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত রাখার জন্যে তাদের ভাষার মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিলেন। ফল এই দাঁড়ালো, সেই জাতির ঐক্যে ফাটল ধরলো এবং তাদের শক্তি খর্ব হলো। আর তারা সেসব অট্টালিকা নির্মাণে ব্যর্থ হলো।

এ উদ্ধৃতিতে যে কারণ দর্শানো হয়েছে এতো কেবল একটি কিচ্ছা মাত্র। কিন্তু এথেকে এই ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিপন্ন হয়, বেবিলনের অধিবাসীরা উঁচু উঁচু অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারদর্শী ছিলো। আর এমন সব উঁচু অট্টালিকা তৈরী করতো যেগুলোকে দেখে সন্দেহ জন্মাতো তারা যেন আকাশের সাথে কথা বলছে অর্থাৎ আকাশ স্পর্শ করছে।

কুরআন করীমেও ফিরাউনের ব্যাপারে এ উদ্ধৃতির অনুরূপ একটি কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এ পার্থক্যের সাথে যে, বাইবেলে তো খোদা তাআলার প্রতি এ ধারণা আরোপ করা হয়েছে, মানুষ উঁচু উঁচু অট্টালিকা নির্মাণ করে ঐশী মর্যাদা লাভ করে ফেলে। আর কুরআন করীম এ নিরর্থক ধারণা ফিরাউনের প্রতি আরোপ করেছে যার সত্যতা সম্বন্ধে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা ফিরাউনের ব্যাপারে বলেছেন, **সে হামানকে বল্লো, 'ফাআও ক্বিদলী ইয়া হামানু আলাত্ত্বীনি ফাজ'আল্লী সারহান লাআল্লী আত্ত্বালি'উ ইলা ইলাহি মূসা-ওয়া ইন্নী লাআযুন্নুহূ মিনাল কাযিবীন** (সূরা কাসাস: ৩৯)।

অর্থাৎ যখন ফিরাউনের সামনে হযরত মূসা আলায়হেস সালাম তাঁর দাবী উপস্থাপন করলেন তখন ফিরাউন তা শুনে নিজ প্রকৌশলী হামানকে ডেকে পাঠালো আর তাকে আদেশ দিলো, মিস্ত্রীদের লাগিয়ে দাও এবং এমন উঁচু অট্টালিকা তৈরী করো ও এমন সব দূরবীন ও মান মন্দির নির্মাণ করো যেন আমি আকাশের রহস্যাবলী উন্মোচন করতে পারি এবং মূসার খোদাকে বের করে আনি।

এভাবে সূরা মু'মিন-এ এসেছে **ওয়া ক্বালা ফিরআউন ইয়া হামানুবনি লী সারহান লা'আল্লী আবলুগুল আসবাবা-আসবাবাস সামাওয়াতি ফাত্ত্বালি'আ ইলা ইলাহি মূসা-ওয়া ইন্নী লা আযুন্নুহ কাযিবা'** (সূরা মু'মিনঃ ৩৭-৩৮) অর্থাৎ ফিরাউন তার প্রকৌশলী হামনকে বল্লো, আমার জন্যে একটি দূর্গ তৈরী করো। কিন্তু এটা হতে হবে এতই উঁচু যেন এতে উঠে আমি আকাশের রহস্যাবলী জানতে পারি এবং মূসার খোদার খোঁজ করতে পারি। আকাশের দিকে উঠে যাওয়া এর উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য এই, এতটা উঁচু হয় যেন সেখান থেকে আকাশের দৃশ্যাবলী সহজে অবলোকন করতে পারি। সেখানে আমি অতি বিরাটকায় দুরবীন স্থাপন করবো এবং মূসার খোদাকে দেখবো। পরিশেষে বল্লো, আসলে আমিতো তাকে সর্বৈব মিথ্যাই জ্ঞান করি। অর্থাৎ কেউ যেন এটা মনে না করে, যে খোদার উল্লেখ মূসা করে থাকে হয়তো সে সত্যি। তোমাকে তো আমি একটি উঁচু অট্টালিকা এজন্যে তৈরী করতে বলছি যেন তাকে আমি অন্বেষণ করতে পারি। আমার এ আদেশের উদ্দেশ্য সন্দেহ করা নয় বরং আমার উদ্দেশ্য মূসার খোদা যে মিথ্যে তা প্রমাণ করে দেখানো।

এভাবে 'আদ' জাতির প্রসঙ্গে আরও একটি আয়াতের উল্লেখ করা যায়। তারা বিরাট বিরাট উঁচু অট্টালিকা নির্মাণ করতো। আর তা এই আল্লাহ তাআলা বলেন, **আতাবনূনা বিকুল্লি রী'ইন আয়াতান তা'বাসূন- ওয়া তাত্তাখিযূনা মাসানি'আ লা'আল্লাকুম তাখলুদূন-ওয়া ইয়া বাত্বাশতুম বাত্বাশতুম জাব্বারীন** (সূরা শো'আরা : ১২৯-১৩১)।

আল্লাহ্ বলেছেন, 'আদ' জাতিকে উদ্দেশ্য করে আমরা বলেছিলাম, তোমরা প্রত্যেক পাহাড়ের ওপর জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ করছো এবং বড় বড় ফ্যাক্টরীসমূহ ও রসায়ন শাস্ত্রের কেন্দ্রসমূহ তৈরী করছো এবং মনে করছো তোমরা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। যেভাবে ইউরোপের লোকেরা আজকাল এটা মনে করে, তাদের সভ্যতা চিরস্থায়ী হবে ('মাসনা' অর্থ ফ্যাক্টরীসমূহ ও রাসায়নিক কারখানাসমূহ)। পুনরায় বলেন, তোমরা যখন কোন দেশের ওপর বিজয় লাভ কর তখন তোমরা সেই স্থানের সভ্যতাকে সমূলে বিনাশ করে দিয়ে থাকো। আর তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির স্থলে তোমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি

প্রতিষ্ঠা কর। (জাব্বার অর্থ অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেকে উঁচু করে যে ব্যক্তি। আর এর আর এক অর্থ অন্য জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিনাশ করে নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করা) **ওয়া ইযা বাত্বাশতুম বাত্বাশতুম জাব্বারীন**– থেকে এ ইস্তেমবাত (অনুসিদ্ধান্ত)-ও করা যেতে পারে যে, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের উদ্ভাবন তাদের যুগেই হয়েছিলো। যেমন তারা যে প্রক্রিয়ায় পাহাড়ে অট্টালিকা নির্মাণ করেছে তাথেকে কোন কোন ঐতিহাসিক এ সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন, সেই জাতি গোলা-বারুদ ও ডিনামাইট উদ্ভাবন করেছিলো। এ অর্থের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা যুদ্ধের এমন সব সরঞ্জাম উদ্ভব করেছিলে যা ছিলো খুবই ধ্বংসাত্মক। আর তোমরা এ দিয়ে অন্যান্য জাতিকে বিনাশ করে নিজেদের সভ্যতা ও নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চাও।

পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শন

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিও এক দর্শনের ওপর রচিত এবং এ দর্শন হলো বস্তুবাদের দর্শন। এর ভিত্তি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর। এ দর্শনের ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা জাতীয়তাবাদের গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে নিয়েছে।

পরম কুরবানী মানুষ তখনই করতে পারে যখন সে মনে করে এ দুনিয়া ছাড়াও অন্য কোন দুনিয়া আছে। আর যদি আমি অন্যদের জন্যে কুরবানী করি তাহলে আমি এ দুনিয়ার কল্যাণ লাভ না করলেও আমার আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে। কিন্তু যা কিছু আছে এ দুনিয়াতেই আছে যার এ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাবে সে বলে, যা কিছু লাভ হয় আমারই যেন হয় অন্যের যেন না হয়।

অতএব কঠোর জাতীয়তাবাদ বস্তুবাদের ফসল। পরে বিলাস-বৈভবের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া এর আর একটি ফসল। প্রত্যেক প্রকারের আরাম-আয়েশের জিনিসপত্র, খাদ্য, পানীয়, পরিধানের জিনিসপত্রে আধিক্যের অভিলাসও বস্তুবাদ থেকে জন্ম নেয়। কেননা, মানুষ মনে করে যা কিছু আমার ভোগ করা দরকার এ দুনিয়াতেই ভোগ করা উচিত। অতএব যত আনন্দ-স্ফূর্তি করতে পারো করে নাও। এ কারণেই পাশ্চাত্য সভ্যতা আরাম-আয়েশকে চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছে দিয়েছে।

রোমান ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে পার্থক্য

রোমান সভ্যতা ও পাশ্চত্য সভ্যতার মাঝে পার্থক্য এই, রোমানদের মাঝে আইনের শাসন ছিলো। আর এ কারণে তাদের দর্শন পূর্ণ থেকে অংশের অর্থাৎ

Generalisation থেকে Particularisation-এর দিকে আবর্তিত হতো। যেমন আমি গ্রীক সভ্যতা ও দর্শনকে রোমান সভ্যতা ও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। দর্শনের সব শাখা-প্রশাখা এ নীতির অনুসারী। তাদের চিকিৎসা শাস্ত্র দেখো তাহলে দেখবে এর ভিত্তিও সামগ্রিতার ওপর রাখা হয়েছে। আবার পরে এথেকে আংশিক ফল গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের ঐশ্বরিক দর্শনের অবস্থাও এটাই। সামগ্রিকতাকে উপস্থাপন করে তাথেকে আংশিক ফল গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি যদিও বস্তুবাদের ওপর রচিত অর্থাৎ আংশিক ফল উপস্থাপন করে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ওপর তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। সামগ্রিকতাকে হয় তো এসব লোক আংশিক ফলের ভিত্তিতে গ্রহণ করে অথবা আংশিক ফলের অস্তিত্বকেই আবার বাজে ও অনর্থক নিরূপণ করে থাকে। একজন হেকিমি চিকিৎসক প্রত্যেক রোগকে দেহের চারটি উপাদানে সীমাবদ্ধ নির্ধারণ করে দিয়ে গোটা চিকিৎসা শাস্ত্রের ভিত্তিতে রোগ নির্ণয় করত চিকিৎসা করে। কিন্তু নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির একজন বিশেষজ্ঞ প্রত্যেক রোগের বিশেষ বিশেষ চিহ্নাদির সন্ধান করত সেসব বিশেষ চিহ্নাদি অনুযায়ী এর চিকিৎসা করে থাকেন। আর সব রকম রোগ-ব্যাধিকে কোন বিশেষ শৃঙ্খলের কড়া নির্ধারণ করার মোটেই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না।

জ্ঞাত ইতিহাসের সাথে যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে এতে পার্থিব আন্দোলন বা সভ্যতার মাঝ থেকে এই পাঁচটি সভ্যতাই পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হয়। আর সারা দুনিয়ার শাসনব্যবস্থা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতাগুলোর ওপর এর প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। বাকী অন্যসব শাসনব্যবস্থা ও দর্শনকে এর অধীনস্থ বলে পরিদৃষ্ট হয়। এ সবের সাথে তাদের মতবিরোধ থাকলেও তা আংশিক। কোন কোন দর্শন এসব দর্শন থেকে আলাদা হয়ে দৃশ্যত একটি নতুন আকার ধারণ করে গিয়েছে এবং খুব সামান্য পরিবর্তনের সাথে কোন কোনটি সেসব দর্শনের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে।

বড় বড় আন্দোলনের সফলতার উপকরণ

এই পাঁচটি আন্দোলনের সফলতার কারণ এটাই যে এদের সাথে একটি বাণী ছিলো। এরা কেবল তরবারী দিয়ে দেশ জয় করতো না। বরং সেই দেশের (লোকদের) মন-মস্তিষ্কও তাদের সেবা-দাস বানিয়ে নিতো। এজন্যে তাদের শাসনক্ষমতা বিনাশপ্রাপ্ত হলেও তাদের দর্শন ধ্বংস হতো না। আর সেই সেবাদাসরাই এ দর্শন নিয়ে দুনিয়াতে শাসন কাজে লেগে যেতো। আর এভাবে এক বুদ্ধি-ভিত্তিক ও জ্ঞান-ভিত্তিক প্রজন্মের ধারা প্রবহমান থাকতো। এসব আন্দোলনের প্রবক্তাগণ ঐশী-নীতি অনুযায়ী কিছু দিন শাসন কার্য চালাবার পর

দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু তাদের আন্দোলন ও সভ্যতা দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠিত থাকে। আজ পর্যন্তও তাদের মাঝ থেকে কোন কোনটির অস্তিত্ব কোন না কোন আকারে পাওয়া যায়। যেমন হিন্দুস্থানে এখন পর্যন্ত আর্য সভ্যতার এ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষৈত্রিয় শূদ্রকে তাদের ধারে কাছে পর্যন্ত ঘেঁষতে দেয় না।

কিছুদিন পূর্বে মাদ্রাজের একটি ঘটনা কোন কোন পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই: এক ব্রাহ্মণের ছেলে এক চামারণীকে বিয়ে করেছে। পিতা-মাতা তাদের ঘর পৃথক করে দিয়েছে। সে চামারনীকে নিয়ে পৃথকভাবে বসবাস করছে। একদিন পিতা-মাতা মনে করলো নিজেদের পুত্রের ঈমান কতটুক তা পরীক্ষা করা উচিত। চামারনীকে বিয়ে করে তার ধর্মকে তো খোয়ায় নি! সুতরাং একদিন তারা তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে এসে খুব করে আচার, চাটনি ইত্যাদি খাওয়ালো। আর পানির যে কয়টি কলসী ছিল হয় ভেঙ্গে ফেল্লো নয়তো লুকিয়ে রাখলো। সে যখন খুব বেশি করে আচার, চাটনি ইত্যাদি খেলো, তার পানির পিপাসা লাগলো। কিন্তু সে এদিক সেদিক কোথাও পানির সন্ধান পেলো না। যেহেতু সে পানি পান করতে পারলো না তাই নিজের বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলো। তার বাড়ী পিতা-মাতার বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে। সেখানে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পৌঁছে গেলো এবং স্ত্রীকে বলতে লাগলো, আমার খুব জলের তেষ্টা পেয়েছে। জল থাকলে পান করাও। সে বলতে লাগলো, জল তো আছে কিন্তু বাটিতো আমার। যদি বলো তাহলে আমার বাটিতে পানি দিই? সে বলতে লাগলো, এতো ধর্মের পরিপন্থী কাজ। শেষ পর্যন্ত যখন পিপাসায় তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো তখন সে মনে করলো, এখন আমি মারা যাবো। সে তার স্ত্রীকে বল্লো, তোমার মুখে পানি নিয়ে আমার মুখে ঢেলে দাও। সুতরাং সে তার মুখে পানি নিয়ে তার মুখে কুলি করে দিলো। মা-বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে এ দৃশ্য দেখছিলো। তারা দৌড়িয়ে এসে তাদের ছেলেকে একথা বলতে বলতে আলিঙ্গন করলো, শোকরিয়া, পরমেশ্বরের দয়ায় আমাদের ছেলে ধর্মভ্রষ্ট হয় নি!

এ কাহিনী গভীর বর্ণ-বিদ্বেষের এক নগ্ন ও হাস্যকর অভিব্যক্তি। এটা আর্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। এতে ধারণা করা যায়, আজ পর্যন্ত এ সভ্যতার গভীর প্রভাব কোটি কোটি মানষের মনে দাগ কেটে আছে। এর কারণে ব্রাহ্মণ-শুদ্রের ঝগড়া এখনও পর্যন্ত হিন্দুস্তানে চলছে।

এ সভ্যতা সম্বন্ধীয় দর্শন কখনো কখনো মিশ্রও হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো এতে নব নব জিনিষের সংযোজন ঘটে থাকে। কিন্তু আসল দর্শনের ছাপ মজুদ থেকেই যায়, বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যেমন, বর্তমানকালে হিন্দুস্তানে এর একটি পরিবর্তনের সূচনা হতে যাচ্ছে। ইংরেজদের দীর্ঘ শাসন এবং পাশ্চাত্য

জাতিগুলোর উন্নতি হিন্দুস্তানে পাশ্চাত্যের জীবন ধারার বীজ বপন করে দিয়েছে। এটা দিনে দিনে সমূলে সুদৃঢ় হচ্ছে। আর এর শাখা-প্রশাখাও চারিদিকে বিস্তৃত হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে এদের উঠাবসাও পাশ্চাত্য কায়দায়। তারা পুরোপুরি পাশ্চাত্য রঙ্গে রঙ্গীন এবং তাদের (অর্থাৎ পাশ্চাত্যের) চশমা দিয়ে তারা সব কিছু দেখে থাকে। স্বাধীনতার সভ্যতা সেই সভ্যতাকে একটি ধাক্কা লাগিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু এভাবেই ঘটেছে যেভাসে পুরনো কালে হয়ে থাকতো। অর্থাৎ উপরিভাগের পরিবর্তনসমূহের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নিজেদের মত করে নিয়ে নিয়েছে। আজ ইংরেজ শাসন হিন্দুস্তান পরিত্যাগ করলেও ইংরেজ শাসনের পদ্ধতি মিটে যেতে পারে না। সেই পরিষদই হবে। সেই পার্লামেন্টই হবে। সেই বিধানই হবে। আর পরিষদের স্পীকারদের সামনে যখনই কোন কঠিন সমস্যা উত্থিত হবে তখন এটাই বলবে, আমি আগামী কাল নাগাদ চিন্তা করে বলবো। আর তার চিন্তা করার অর্থ এই হবে যে এ অবস্থায় আমার কী সিদ্ধান্ত প্রদান করা উচিত। পাশ্চাত্যের পার্লামেন্টের বিধান দেখে সমাধান বের করবে। মোট কথা এ পরিবর্তন যা হিন্দুস্তানে সৃষ্টি হবে তা তেমনই যেভাবে ইংল্যান্ডে মি. বাল্ডউইন-এর স্থলে মি. চেম্বারলিন নিয়েছিলেন। অথবা ভবিষ্যতে তার জায়গায় সম্ভবত মেজর এটলী নিবেন। নতুবা কোন নতুন সভ্যতা এ সময়ে প্রকাশিত না হলে পাশ্চাত্যই এখানে শাসন কার্য চালাতে থাকবে যেন এর আকৃতি সামান্য একটু বদলিয়ে গেছে। গান্ধী জ্বি যাকে নতুন চিন্তাধারার একজন উদ্ভাবক বলা হয়ে থাকে তিনিও মৌলিকভাবে হলেও পাশ্চাত্য প্রভাবকে রহিত করার জন্যে সেই দর্শনেরই অনুগামী হয়ে চলেছেন। যখনই তিনি কোন নতুন কথা সম্বন্ধে চিন্তা করেন তিনি সেই পাশ্চাত্য সভ্যতারই অনুসারী হয়ে যান। আর যেহেতু পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি বস্তুবাদিতার ওপর, এর নীতি হলো, এ মুখ থেকে অন্য কিছু বলো আর কাজে অন্য কিছু করো। এজন্যে গান্ধি জ্বী-এর অনুসারীরাও মুখে চিৎকার করে বলতে থাকে শান্তি শান্তি কিন্তু ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নেয়। মুখে বলে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত করো অহিংসা প্রতিষ্ঠিত করো। কিন্তু কার্যত প্রত্যেক বিপ্লবের সময়ে কুড়িতে কুড়িতে মুসলমানকে জবাই করে দেয়। কেননা, এ নীতি কেবল বলার জন্যে, কার্যত করে দেখাবার জন্যে নয়।

প্রকৃত কথা এই, যখন বস্তুবাদের প্রভাবের অধীনস্থ মানুষ এটা বুঝে নেয় পরকাল বলতে কিছুই নেই তখন আবার এতে সেই ব্যক্তির বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া থেকে কোন্ জিনিষ প্রতিবন্ধক হতে পারে যাকে সে স্বীয় শত্রু ভেবে বসে? সে তো প্রত্যেক রঙ্গে নিজের বিরোধিতাকে বাধা দেওয়ার জন্যেই চেষ্টা করে থাকে। অতএব কংগ্রেসী যদিও মুখ দিয়ে এটা বলতে থাকে, আমরা গান্ধি-দর্শনের অনুসারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্ম পাশ্চাত্য দর্শনের ওপরই রয়েছে। আর

যতক্ষণ জড়বাদিতার প্রভাব তাদের অন্তর থেকে দূরীভূত না হবে ততক্ষণ তারা ইউরোপের নাটক হিন্দুস্তানের ষ্টেজে প্রতীকস্বরূপ দেখাতে থাকবে।

মোটকথা এ পাঁচটি আন্দোলনের সফলতার আসল কারণ এটাই। এদের পেছনে একটি দর্শন ছিলো। এদের প্রবক্তারা কেবল লোকদের দেশই জয় করতো না বরং তাদের মন মস্তিষ্ককেও সেবাদাস বানিয়ে নিতো। বাহ্যিক দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করার পরও কখনো সে দাসত্ব হাজার হাজার বছর ধরে বহাল থাকতো।

ধর্মীয় জগতেও প্রকৃত সফলতা বিপ্লবের মাধ্যমেই হয়ে থাকে

ধর্মীয় জগতেও এ নীতি প্রচলিত আছে। এতেও সত্যিকারের সফলতা বিপ্লবের মাধ্যমেই এবং বিপ্লবের কারণেই হয়ে থাকে। বিপ্লব সাধিত না হলে ধর্ম কখনো সফল হয় না। কেননা, এটা ঐশী বিধানের পরিপন্থী। ঐশী বিধানের কর্ম-বিধায়ক খোদা তাআলা স্বয়ং। একে উপেক্ষা করে সফলতা লাভ হতে পারে না।

'ইনকিলাব' বা বিপ্লবের অর্থ কোন জিনিস একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। এখন তুমি একটি পুরোনো অট্টালিকার স্থলে নতুন অট্টালিকা নির্মাণ করতে চাইলে যার নকশা একেবারে নতুন অবশ্যই তোমাকে প্রথম অট্টালিকাটি ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আর কোন বোকাই এমন আছে যে নতুন অট্টালিকা তো তৈরী করতে চায় কিন্তু পুরোনো অট্টালিকাটি ভাঙ্গবার জন্যে প্রস্তুত নয়।

কুরআন করীমও ধর্মীয় উন্নতিকে এরূপ বিপ্লবাত্মক পন্থার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন– **'ওমা নুরসিলুল মুরসালীনা ইল্লা মুবাশশিরীনা ওয়া মুনযিরীনা ফামান আমানা ওয়া আসলাহা ফালা খওফুন 'আলায়হিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানূন। ওয়াল্লাযীনা কায্যাবু বিআয়াতিনা ইয়ামাসসুহুমুল 'আযাবু বিমা কানূ ইয়াফসুকূন** (সূরা আন'আম: ৪৮-৪৯)।

অর্থাৎ আমরা পৃথিবীতে যখনই কোন রসূল প্রেরণ করি সে সর্বদা পৃথিবীতে দুটি ঘোষণা দান করে থাকে। প্রথমত তার আসার পূর্বে যে ব্যবস্থাপনা জারী ছিল সে সেটির মৃত্যুর ঘোষণা দেয়। দ্বিতীয়ত সে তার আনীত ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন কথায় এ ঘোষণা করে দেয়, একে এর আসল আকৃতিতে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং কোন প্রভাব বা চাপের কারণে অথবা কোন জাতির সাথে সমঝোতা বা আপোষ করার উদ্দেশ্যে এর কোন পরিবর্তন করা হবে না। এসব ঘোষণার পর যে লোক এ নতুন ব্যবস্থাকে অনুসরণ করবে এবং নিজেকে এর রঙ্গে সাজাবে সে ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। যে এরূপ করে না সে আস্তে আস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হতে থাকে।

'আসলাহা'-এর অর্থ নিজেকে নিজে কোন জিনিষের মত বানিয়ে নেয়া। অতএব 'আমলে সালেহ'-এর অর্থ সেই কর্ম যা নতুন আন্দোলন অনুযায়ী করা হয়। 'আমলে সালেহ' অর্থ পুণ্যকর্ম করা নয় যেভাবে সাধারণত মানুষ মনে করে থাকে। পুণ্যকর্ম ও 'আমলে সালেহ'-এর মাঝে তফাৎ রয়েছে। যেমন, নামায আদায় করা একটি পুণ্য কাজ। কিন্তু কোন লোক জেহাদের সময়ে নামায পড়া শুরু করে দিলে আমরা বলবো, সে 'আমলে সালেহ' করে নি। অথবা রোযা রাখা একটি পুণ্য কাজ। কিন্তু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার জেহাদের সময়ে কোন কোন রোযাদারের প্রসঙ্গে বলেছেন, আজ যেসব লোক রোযা রাখে নি তারা রোযাদারগণের চেয়ে পুণ্যে আগে বেড়ে গেছে। কেননা, সেসব রোযাদার এমন অবস্থায় রোযা রেখেছে যখন অবস্থার প্রেক্ষিতে রোযা না রাখা অধিক উপযোগী ছিলো।

মোটকথা আরবী ভাষায় 'আমলে সালেহ' অর্থ-সময়োপযোগী কাজ করা। অতএব **ফামান আমানা ওয়া আসলাহা**-এর এই অর্থ নয়, যারা রসূলগণের ওপর ঈমান এনেছে এবং যারা নামায পড়েছে আর রোযা রেখেছে তারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছে। বরং এর অর্থ এই সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং নবীদের শিক্ষানুযায়ী নিজেরা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন এনেছে এবং সেই অট্টালিকার ইটস্বরূপ পরিণত হয়েছে যার নির্মাণ কাজ যুগনবীর হাতে আরম্ভ হয়েছে। তাদের কোন ভয় এবং কোন দু:খ নেই। কিন্তু এর বিপরীতে যেসব লোক নিজেরা নিজদিগকে এ শিক্ষানুযায়ী গঠন করে না এবং নতুন অট্টালিকার অংশ হতে অস্বীকৃতি জানায় **ইয়ামাসসুহুমুল 'আযাবু বিমা কানূ ইয়াফসুকূন**। এদের ওপর আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি অবতীর্ণ হবে এবং ধ্বংপ্রাপ্ত অট্টালিকার মত এদের ধ্বংস করে ছেড়ে দেয়া হবে।

নবীদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

এ আয়াতে এটা সুস্পষ্ট আল্লাহ্ তাআলার যে নবীই এ দুনিয়াতে আসেন তিনি এজন্যে আসেন যেন তাঁর পূর্বের ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেন এবং একটি নতুন ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করেন। আর তাঁর আগমনের পর সেই লোকই নব-জীবন লাভ করে যে তাঁর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে। এ কথা ছোট হোক বা বড় প্রত্যেক নবীর আবির্ভাবের পরে অবশ্যই প্রকাশিত হয়। কিন্তু যিনি মহান রসূল হন তাঁর আবির্ভাবের পর মনে হয় যেন একটি কিয়ামতসদৃশ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন সেসব নতুন অন্দোলনের আবির্ভাবে সৃষ্টি হয়, যে সম্পর্কে আমি ওপরে আলোকপাত করে এসেছি। অবশ্য যিনি শরীয়তবাহী রসূল হিসেবে আসেন তিনি তাঁর পূর্বের নবীর বিধানকে রহিত করে দেন। কিন্তু যিনি শরীয়ত নিয়ে

আসেন না তিনি পূর্ববর্তী নবীর বিধানকে রহিত করেন না। কিন্তু আধুনিক রীতি-নীতিসম্মত বিধি-বিধানকে অবশ্যই রহিত করে দেন যা পূর্ববতী শরীয়তবাহী নবীর শরীয়তকে বিভ্রান্ত করে লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা মত তৈরী করে নিয়ে থাকে।

ধর্মীয় বিপ্লবাদির পদ্ধতি

ধর্মীয় জগতে যে প্রকার বিপ্লবাদির সৃষ্টি হয় এসবের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন– **মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বিখাইরিম্ মিনহা আও মিসলিহা– আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা 'আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা লাহূ মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরয। মা লাকুম মিন দুনিল্লাহি মিঁওয়ালিইওয়ালা নাসীর** (সূরা বাকারা: ১০৭-১০৮)।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিগত যুগগুলোতে যে বাণী আসছিলো বা ভবিষ্যতে আসতে থাকবে সে সবের ব্যাপারে একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। আর তা এই, কখনো তো তা নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করে ছিলো আর যা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে এর স্থলে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা আকাশ থেকে প্রবর্তিত হয়। আর কখনো লোকেরা সেসব ভুলিয়ে দেয় এবং কেবল সেসব বিষয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়, যেসব ব্যবস্থাপনা লোকদের অমনোযোগিতার কারণে ঐশী ব্যবস্থাপনার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ওগুলোকে বিনাশ করে আবার নতুন আকারে সেই পূর্বতন ঐশী-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যখন ঐশী-ব্যবস্থাপনাই নিজ প্রয়োজন পুরো করে বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তাআলা এ থেকে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থাপনা দুনিয়াতে প্রেরণ করে দেন। আর যখন সেই ব্যবস্থাপনা তো ঠিকই থাকে কেবল লোকেরা একে ভুলে যায় তখন আল্লাহ্ তাআলা সেই পূর্বতন ব্যবস্থাপনাকে হুবহু পুনরায় দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা এ উভয় মহিমা ও শক্তির অধিকারী।

আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় বলেন– **আলামতা'লাম আন্নাল্লাহা লাহূ মুলকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরয**– তোমাদের কি জানা নেই, আমরা কেন এরূপ করি? আমরা একটি মহাবিপ্লব সৃষ্টি করার জন্যে এবং একটি নতুন আকাশ ও একটি নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্যে এরূপ করে থাকি। এটা সুস্পষ্ট, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে কাফিরদের এ বিষয়ের ওপর ক্রোধ ছিলো না যে, তাদের ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী এক ধ্যান-ধারণা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উপস্থাপন করেছেন। তাদের যে কথার ওপর আপত্তি ছিলো এবং যার কথা চিন্তা করলেও তাদের কষ্ট অনুভূত হতো তা ছিলো এই, কুরআনের অনুশাসন না আবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতএব বলা হয়েছে– **আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা লাহূ মুলকুস্সামাওয়াতি ওয়াল আরয**– হে

অস্বীকারকারী! তোমাদের কি জানা নেই, খোদা পৃথিবী ও আকাশসমূহের মালিক? অতএব যখন তিনি এ রাজত্ব একটি নুতন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত পূর্ণ করার ব্যাপারে কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে?

ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতার সীমারেখা

মোটকথা কুরআন করীম ধর্মের ব্যাপারেও এই নীতি নির্ধারণ করেছে। প্রত্যেক ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা যা প্রবর্তন করা হয়ে থাকে তা কিছু দিন পর হয় অকার্যকর হয়ে যায় অথবা লোকেরা তা ভুলে যায়। অকার্যকর আবার দুভাবে হয়ে থাকে। লোকেরা এতে হয় মিশ্রণ ঘটায় অথবা যুগের চাহিদানুযায়ী এর মাঝে শিক্ষা থাকে না। অর্থাৎ লোকেরা এর শিক্ষার মাঝে হয়তো বাড়িয়ে বা কমিয়ে ফেলে নয়তো শিক্ষা সংরক্ষিতই থাকে কিন্তু যুগ যেহেতু উন্নতি করে গিয়ে থাকে এজন্যে তা কর্মোপযোগী থাকে না। এ দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যেতে পারে। যেভাবে কারও পোষাক ছিঁড়ে যায় এবং তার নুতন কাপড় সেলাই করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অথবা শিশুর বেলায় তার পোষাক তো ঠিকই থাকে কিন্তু তার দৈহিক বৃদ্ধির কারণে তার দেহে পূর্বের পোষাক খাটে না এবং নতুন পোষাক তৈরী করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তা বিকৃত হয়ে বদলে যায় নতুবা এজন্যে পরিবর্তীত হয়ে যায় যে, মানুষের অবস্থায় এমনভাবে পরিবর্তন আসে, পূর্বতন শিক্ষা আর তাদের জন্যে উপযোগী থাকে না। আর আল্লাহ্ তাআলা তখন সিদ্ধান্ত নেন, এখন তাদের জন্যে অন্য শিক্ষার প্রয়োজন।

শিক্ষা বিকৃত হওয়ার যে অবস্থা এ-ও প্রকৃতপক্ষে সেই সময়েই ঘটে থাকে যখন সেই শিক্ষা অকার্যকর বলে প্রতিপন্ন হয়। নচেৎ এর পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা নিজেই তাঁর ধর্মের সংরক্ষণ করে থাকেন। অবশ্য এ শিক্ষার প্রয়োজনের যুগ শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাআলা বান্দাগণকে বলেন, এখন এর মাঝে পরিবর্তন করে নাও, আমার কথা চিন্তা করো না। যেভাবে ঘরে কখনো কখনো কোন খারাপ ও ছিন্ন এবং পুরোনো কাপড়া চোপড় ছেলে পেলেরা ছিঁড়ে ফেলে দিলে আমরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করি না। এভাবে ধর্মে যোগ-বিয়োগের অনুমতি আল্লাহ্ তাআলা সে সময়ে দিয়ে থাকেন। যখন যুগের এ শিক্ষার প্রয়োজন থাকে না এবং মানুষের অবস্থা নতুন শিক্ষার প্রত্যাশা করে থাকে। তাই সেই সময়ে আল্লাহ্ তাআলা ধ্বংসপ্রাপ্ত ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ পরিত্যাগ করেন এবং বান্দাদের অনুমতি দিয়ে দেন, তারা এ নিয়ে বাড়া-বাড়ি করে ও এ নিয়ে খেলা-তামাশা করে। মানুষ এটা মনে করে, তারা খোদা তাআলার শিক্ষা নিয়ে খেলা করছে,

যদিও যুগোপযোগী না হওয়ার কারণে খোদা সেই শিক্ষা বান্দাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়ে থাকেন আর তাঁর সংরক্ষণের হাত তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে থাকেন।

অতএব আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, ঐশী বাণীর ব্যাপারে দুটি অবস্থা আছে–

ক) যখন এটা অকার্যকর হয়ে যায় তখন আমরা এ থেকে উৎকৃষ্টতর শিক্ষা নিয়ে আসি। 'উৎকৃষ্টতর' শব্দ এজন্যে ব্যবহার করা হয়েছে যে, পূর্বতন শিক্ষা অকার্যকর হয়ে গিয়েছে আর এখন এথেকে উৎকৃষ্টতর শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উৎকৃষ্টতর শিক্ষার প্রয়োজন না হলে পূর্বতন শিক্ষাই যথেষ্ট হতো। এ তাৎপর্য তুলে ধরার জন্যে **না'তি বিখায়রিম মিনহা**-বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা এই, শিক্ষাতো কার্যকরী থাকে কিন্তু লোকেরা তদনুযায়ী কাজ করা ছেড়ে দেয় এবং নিজেরা নিজেদের জন্যে ঐশী শিক্ষার পরীপন্থী নিয়ম-নীতি তৈরী করে নেয়। এ অবস্থায় নতুন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না বরং পুরোনো শিক্ষার অনুশাসনটিকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এজন্যে বলা হয়েছে– **আও মিসলিহা** অর্থাৎ শিক্ষা যখন প্রকৃত অবস্থায় মজুদ থাকে কেবল লোকেরা এর ওপর আমল করা ছেড়ে দিয়ে থাকে তখন আমরা আবার সেই শিক্ষাই নিয়ে আসি অর্থাৎ সেই শিক্ষা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে দেই। **মিসল** শব্দ খোদা তাআলা এজন্যে ব্যবহার করেছেন যেন এটা বলে দেন, পূর্বতন শিক্ষা যেহেতু মৃত হয়ে গেছে তাই আমরা এতে নবজীবন সঞ্চার করছি। আর এভাবে এ এক রঙ্গে পূর্বতন শিক্ষারই অনুরূপ।

অতএব এ আয়াতে বলা হয়েছে, ঐশী-বাণীও এক নির্দিষ্ট সময় পরে: (১) হয় কার্যকরী থাকে না, (২) নতুবা লোকেরা এর ওপর আমল করা ছেড়ে দেয়। অকার্যকর আবার দুভাবে হয়ে থাকে :

(১) লোকেরা এতে মিশ্রণ ঘটিয়ে দেয় এবং

(২) যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে শিক্ষা থাকে না।

এ উভয় অবস্থায় প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলার দুটি রীতি প্রবহমান রয়েছে। ঐশী-বিধান অকার্যকর হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাআলা এটা রহিত করে দেন এবং এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর বিধান প্রেরণ করেন। কেননা, যুগ উন্নতির দিকে ধাবমান থাকে কিন্তু লোকেরা যখন আমল বা কর্ম পরিত্যাগ করে দেয় কিন্তু শিক্ষা সংরক্ষিত থাকে তখন আল্লাহ্ তাআলা সেই বিধানেরই পুনরাবৃত্তি করেন এবং এর অনুরূপ শিক্ষা অবতীর্ণ করে দেন অর্থাৎ সেই শিক্ষার মাঝে একটি নব-জীবন সঞ্চার করে দেন।

এ আয়াতের শেষে এই যে বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে করো যে, আল্লাহ্ তাআলা এ কথার ওপর সর্বশক্তিমান নন। এসব কথা থেকে সেই অর্থ যা সাধারণভাবে এ আয়াত থেকে নেয়া হয় অর্থাৎ বলা হয়, এই আয়াতে কুরআনের আয়াত মনসুখ (রহিত) হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে, তা নাকচ প্রতিপন্ন হয়ে যায়। কেননা, কুরআনের আয়াত রহিত হওয়ার সাথে ঐশী শক্তি ও মহিমার তাৎপর্য এসব অর্থেই পাওয়া যায় যা আমি করে এসেছি।

আবার এই যে বলা হয়েছে **আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা লাহূ মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরয**– এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, প্রত্যেক বিধান যা আগমন করে বা যখন একে পুনরায় জীবিত করা হয় এ একটি বিপ্লব প্রত্যাশা করে এবং এ বিষয়টিই লোকদের ধারণায় অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এরূপ বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। নব-বিধানের মাধ্যমেই সে বিপ্লব সৃষ্টি করেন বা পুরনো বিধানকেই জীবিত করে বিপ্লব সৃষ্টি করে দেন না কেন।

যে অর্থ আমি করে এসেছি, যদিও নতুন কিন্তু আয়াতের সব অংশের সমাধান এসব অর্থেই সাধিত হয়। প্রাচীন তফসীরকার এর অর্থ এই করছিলেন, কুরআনের কোন কোন আয়াত আল্লাহ্ তাআলা অবতীর্ণ করেন এবং পরে সেগুলো রহিত করে দেন। বিরুদ্ধবাদীরা এসব অর্থ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো এবং বলতো, সেই আয়াত অবতীর্ণ করে তা কেন রহিত করেন? এ আদেশ যে মানুষের জন্যে সময়োপযোগী নয় তাঁর কি বিধান অবতীর্ণ করার সময়ে এ জ্ঞান ছিলো না। দ্বিতীয়ত 'নাসখ' শব্দে তাঁর দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়। আর এটা উল্লেখের পর এ কথা বলার কী অর্থ হয় **ইন্নাল্লাহা 'আলা কুল্লি শায়ঈন কাদীর**। কিন্তু যে অর্থ আমি করেছি এতে একটি শক্তিশালী কুদরত ও মহিমার প্রকাশ ঘটে। লোকদের হৃদয়ে পাথরের মত অঙ্কিত হয়ে গেছে এমন একটি বিধান পরিত্যাগ করার জন্যে তারা কোন মতেই প্রস্তুত নয়। অথবা একটি জাতি যখন মরে গেছে এবং ঐশী-নীতিকে দলিত মথিত করে দিয়েছে ও এর সৌন্দর্যের প্রতি অমনোযোগী হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে একে ধ্বংস করে এর জায়গায় একটি নতুন বিধান প্রবর্তন করে দেয়া সহজসাধ্য নয়। পুনরায় মৃত জাতির মাঝ থেকে একটি অংশকে জীবিত করে সেই বিস্মৃত শিক্ষার অনুশাসন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করে দেয়া অবশ্যই একটি বড় কঠিন কাজ। আর এটা আল্লাহ তাআলার মহান শক্তি ও মাহাত্ম্যের প্রমাণ বহন করে। এ কুদরতের অধিক বিকাশের

জন্যে আয়াতের শেষে এ অতিরিক্ত বাক্যও সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে, **আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা লাহূ মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরয**– তোমাদের কি জ্ঞান নেই, পৃথিবী ও আকাশসমূহের সর্বাধিপত্য খোদারই নিয়ন্ত্রণে আছে? আর তিনি এরূপ বিপ্লবকে সহজেই সৃষ্টি করতে পারেন।

'আস্‌সা'আত' অর্থ

প্রকৃতপক্ষে মহান নবীগণ এক একটি কিয়ামত সদৃশ্য হয়ে থাকেন। তাঁদের মাধ্যমে পুরোনো প্রজন্মকে মিটিয়ে দেয়া হয় এবং একটি নব-প্রজন্মের প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাঁরা যদিও নতুন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেন তাদের যুগকে ধর্মীয় পরিভাষায় 'কিয়ামত দিবস'ও বলা হয়। তাঁদের যুগে কিয়ামত দিবসের উভয় বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ একবার যুগের সব লোকের ওপর মৃত্যু এবং পরে দ্বিতীয়বার জীবন লাভ। নবীগণের আবির্ভাবের সাথেই প্রথমে তো দুনিয়াতে মৃত্যুর বহির্প্রকাশ ঘটে এবং ঐশী নৈকটের সে দরজা যা প্রথমে তাদের জন্যে খোলা ছিলো সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং পরে সেই যুগের নবীর মাধ্যমে ঐশী নৈকট্যের নব-অর্গল উন্মোচন করা হয় যেন প্রাথমিক অট্টালিকাকে তাঁরা বিধ্বস্ত করে দেন এবং এর জায়গায় নতুন অট্টালিকা দাঁড় করিয়ে দেন। প্রাথমিক অট্টালিকা রহিতকৃত শরীয়ত বা বিধানই হোক অথবা মানুষ কর্তৃক স্বনির্মিত অট্টালিকা হোক। সংরক্ষিত বিধানকে পরিত্যক্ত মনে করে যেভাবে কোন কোন লোক নিজেরা তা দাঁড় করিয়ে নিয়েছে। এ যুগকে কুরআনের পরিভাষায় আস্‌সা'আতও বলা হয়।

রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে কুরআন করীমে এসেছে– **যুয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারুল হায়াতুদ্দুন্‌য়া ওয়া ইয়াসখারূনা মিনাল্লাযীনা আমানূ। ওয়াল্লাযীনাত্তাকাও ফাওকাহুম ইয়াওমাল কিয়ামাতি - ওয়াল্লাহু ইয়ারযুকু মাঁইয়াশাউ বিগয়রি হিসাব** (সূরা বাকারাঃ ২১৩)।

অর্থাৎ যারা কুফরী করে তাদের কাছে পার্থিব জীবনের জিনিষ-পত্র বড়ই সুন্দর দৃশ্যমান হয় এবং তারা মু'মিনদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করে। **ওয়া ল্লাযীনাত্তাকাও ফাওকাহুম ইয়াওমাল কিয়ামাতি**– অথচ কিয়ামতের দিবসে মু'মিনগণ তাদের ওপর বিজয়ী হবে।

সুতরাং **ফাওকাহুম ইয়াওমাল কিয়ামাতি**– এ দৃশ্য সেই কিয়ামতের দিবসেও সংঘটিত হবে যা মৃত্যুর পরে আসবে। তখন কাফিররা দোযখে প্রবেশ করবে এবং মু'মিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু সেই কিয়ামতের দিন থেকে লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। আর এ আয়াত সেই বিষয়ের সত্যতার যুক্তিপ্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অতএব এ আয়াতে কিয়ামত

দিবসের অর্থ সেই দিন যেদিন মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সফলতা লাভ হয়েছিলো এবং কাফিররা পরাজিত হয়েছিলো। যেদিন দুনিয়া এ আশ্চর্য দৃশ্য দেখলো, যিনি একা ছিলেন এবং জাতির নির্যাতনের শিকার ছিলেন এখন তিনি শাসনকর্তা হয়ে গেলেন। আর যারা দেশের শাসক ছিলো তারা প্রজা হয়ে গেলো।

'ইক্বতিরাবুস্ সা'আত' অর্থ

কুরআন করীমের অপর এক জায়গায় রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগকে 'আস্ সা'আত' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে– **ইক্বতারাবাতিস্ সা'আতু ওয়ান শাক্ ক্বাল্ মারু** (সূরা ক্বামারঃ ২) অর্থাৎ কিয়ামত এসে গেছে এবং এর প্রমাণ এই, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গেছে। চন্দ্র কিভাবে বিদীর্ণ হয়েছে? আমি এখন এ বিতর্কে যেতে চাচ্ছি না বরং আমি আয়াতের প্রথম অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনার পর তেরশ বছর (এখন চৌদ্দশ বছর) অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং চৌদ্দশ শতাব্দীর (এখন পনরশ) অর্ধেকের অধিক সময় পর্যন্ত চলে গেছে কিন্তু কিয়ামত এখন পর্যন্ত সংঘটিত হয় নি। যদিও আল্লাহ্ তাআলা বলেছিলেন, যেহেতু চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে এখন কিয়ামতও এসে গেছে মনে করো। এটাও চিন্তা করার বিষয় বিদীর্ণ হওয়ার সাথে মৃত্যুর পরে আগমনকারী কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কী সম্পর্ক? চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া দিয়ে প্রতিশ্রুত কিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা বুঝালে তো সেই কথাই দাঁড়ালো যেভাবে বলা হয় 'মারূ ঘুটনা ফুটে আঁখ' (অর্থাৎ বাংলায় বলা যেতে পারে– ধান ভানতে শীবের গীত) আসল কথা, এই আয়াতে কিয়ামত বলতে মৃত্যুর পরের কিয়ামত বুঝায় নি। বরং এতে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিজয়কে বুঝাচ্ছে। সেই আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের প্রতি ইঙ্গিত যা তাঁর মাধ্যমে সংঘটিত হওয়ার ছিলো এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার যে ঘটনা, তা যে রঙ্গেই ছিলো প্রকৃতপক্ষে আরবের শাসন-ক্ষমতা লোপ পাওয়ার ব্যাপারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। যেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান অনুযায়ী চন্দ্র দিয়ে আরবের শাসন-ক্ষমতা বুঝানো হয়েছে। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা আরবের তদানীন্তন শাসন-ব্যবস্থার পরিসমাপ্তির ওপর দিকনির্দেশ করে। আর এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হলো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিজয় ও তাঁর শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন। তাই আমরা তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেই দিন আসার পূর্বে তোমরা নিজেদের সংশোধন করে নাও।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ

চন্দ্রকে কাশ্‌ফে বা স্বপ্নে দেখার বিষয়টি দিয়ে আরব শাসন বা আরব-নেতা বুঝায়। আরবীদের মাঝে এটা স্বীকৃত ছিলো। অন্য ধর্মের লোকেরাও এ দিয়ে এ অর্থই গ্রহণ করতো। যেমন ইতিহাসে এসেছে, খয়বর বিজয়ের পরে এক ইহুদী সর্দারের কন্যা হযরত সফিয়া (রা:) হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর রসূলে করীম (স:) তার এক গালে লম্বা লম্বা কিছু দাগ দেখলেন। তিনি (স:) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দাগ কিসের? তখন তিনি বল্লেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, চন্দ্র টুকরো হয়ে আমার কোলে এসে পড়েছে। এ স্বপ্ন দেখে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং আমার স্বামীকে এটা শুনালাম। তিনি আমার পিতার কাছে এর উল্লেখ করলেন। আমার পিতা ছিলেন ইহুদীদের একজন বড় আলেম। তিনি যখনই এ স্বপ্নের কথা শুনলেন তখনই রাগান্বিত হলেন। আর জোরে আমার মুখের ওপর থাপপর মারলেন এবং বল্লেন, তুই কি আরবের বাদশাকে বিয়ে করতে চাস? স্বপ্নে চন্দ্রের অর্থ তো আরবের বাদশাহ। আর তার কোলে পড়া মানে তার সাথে বিয়ে হওয়া। এ থাপ্‌পর এত জোরে দেয়া হয়েছে যে, এর দাগ আমার গালে বসে গিয়েছে। এখন পর্যন্ত এর সামান্য চিহ্ন রয়ে গেছে।

মোটকথা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার দৃশ্য যেভাবেই দেখানো হয়েছিলো প্রকৃতপক্ষে এ একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। এটা আরবদের শাসন-ব্যবস্থার ধ্বংসের সংবাদ বহন করে এসেছিলো। এ ব্যাখ্যা কুরআন করীম এ আয়াতে করেছে এবং বলেছে, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ আরবদের শাসনকাল শেষ হয়ে আস্‌ছে। আর এর স্থলে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শাসন প্রবর্তন করে শীঘ্রই আধ্যাত্মিক কিয়ামত সংঘটিত করা হবে।

'লাওলাকা লামা খালাকতুম আফলাক' অর্থ কী?

লাওলাকা লামা খালাকতুল আফলাক– ইলহামটি একের অধিক নবীর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এরও তাৎপর্য এই, তুমি তোমার যুগের ব্যবস্থাপনার একটি স্তম্ভরূপ। এ জগতের কেন্দ্র তুমি। তুমি না সৃষ্টি হলে একে সৃষ্টিই করতাম না। এ অর্থ নয়, কোন কোন নবী এমন গত হয়ে গেছেন, তাদের সত্তা সৃষ্টি না হলে আল্লাহ্‌ তাআলা এ জগত সৃষ্টিই করতেন না। প্রত্যেক আধ্যাত্মিক বিপ্লব নিজ নিজ নবীর মর্যাদানুযায়ী হয়ে থাকে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক যোগ্যতাসমূহের প্রতিবিম্ব হয়ে থাকে। আর নবী যেন সেই বিপ্লবের জন্যে জন্মদাতা পিতার মত

হয়ে থাকেন এবং যেভাবে পিতা ছাড়া সন্তান হয় না তেমনি আধ্যাত্মিক বিপ্লব নবী ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং এটা বলা যথার্থ এবং একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা, সেই নবী না হলে সেই নতুন আধ্যাত্মিক আকাশ ও পৃথিবী, যা তার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সৃষ্টি করা হতো না।

লাওলাকা লামা খালাকতুল আফলাক– ইলহামটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর কাছে হয়েছে। আর তাঁর আগে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপর এ ইলহামটি অবতীর্ণ হয়েছিলো। এখন এ ইলহামে পৃথিবী ও আকাশের অর্থ জড় সৌর জগতকে ধরে নেয়া হলে এটা আর্শ্চযজনক কথা হবে যে, আগে আল্লাহ্ তাআলা একজন নবীকে বলেন তুমি না হলে আমি এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করতাম না। এরপর অন্য এক নবীকে বলেন, তুমি না হলে আমি এ আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করতাম না। অতএব এ বিষয় সুস্পষ্ট, এ আকাশ ও পৃথিবী বলতে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা বুঝাচ্ছে যা নবীর মাধ্যমেই দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর আমি মনে করি, প্রত্যেক সেই নবী, যার মাধ্যমে এরূপ বিপ্লব সাধিত হয়েছে তাঁর কাছে এমন ইলহামই হয়ে থাকবে। অবশ্য আমরা একথা বলতে পারি, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যেহেতু সর্বযুগের জন্যে ও গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে প্রেরিত হয়েছেন তাই তাঁর জন্যে এ ইলহাম সর্বযুগ দৃষ্টিপটে রেখে বুঝতে হবে এবং অবশিষ্ট নবীদের জন্যে যুগ ও স্থান বিশেষে মনে করতে হবে।

'আফলাক'-এর অর্থ ও ইন্‌জীল

পৃথিবী ও আকাশের যে অর্থ আমি করেছি ইন্‌জীল থেকেও এ অর্থের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মথি-এর ৫ অধ্যায়ের ১৮ নং শ্লোকে লেখা আছে –

'কেননা, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার (তওরাত– উদ্বৃতিকার) এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।'

এ শ্লোকে আকাশ ও পৃথিবী বুঝতে মুসায়ী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য এই, যতক্ষণ মূসায়ী সিলসিলার যুগ চলবে তওরাতের শিক্ষাকে মিটানো যেতে পারে না। অবশ্য যখন সিলসিলা মিটে যাবে তখন নি:সন্দেহে এ শিক্ষা থাকবে না। আর প্রকৃত কথাও এই, কুরআন করীম এসে তওরাতের শিক্ষাকে রহিত করে দিয়েছে। আর তওরাতেও লেখা আছে, হযরত মূসার পরে আরও এক শরীয়ত আসবে। যেমন দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ের ১৮-১৯ শ্লোকে

লেখা আছে– 'আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব আর আমি তাহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন তাহাতে যে কেহ বর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব'।

এসব শ্লোক থেকে নিম্নোক্ত ফলাফল বের হয়–

ক) ইহুদীদের জন্যে আরও একজন নবীর আবির্ভাব হবে। কেননা, লেখা আছে– 'আমি তাহাদের জন্য এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব'।

খ) তিনি হযরত মূসার মত একজন শরীয়তধারী হবেন। কেননা, লেখা আছে– 'তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব'।

গ) তিনি বনী ইসমাঈলের মাঝ থেকে হবেন। বনী ইসরাঈলের মাঝ থেকে হবেন না। কেননা, লেখা আছে– 'উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে হইতে হইবে তাহাদের মধ্যে হইতে হইবে না'।

ঘ) তাঁর আনুগত্য করা ইহুদীগণের জন্যে অবশ্যকর্তব্য হবে। কেননা, লেখা আছে– 'তাহাদের জন্য তিনি আবির্ভূত হইবেন'।

ঙ) ইহুদীগণ তাঁর কথা না মান্য করলে তাদের বিনাশ করে দেয়া হবে এবং তাদের কিয়ামত এসে যাবে। কেননা, লেখা আছে– 'যে তাঁহার কথা শুনিবে না তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব'।

এ ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও এটা বলা যায় না, হযরত মসীহ্ (আ:)-এর উদ্দেশ্য ছিলো সৌর জগতের স্থায়িত্ব থাকা অব্দি মুসায়ী শরীয়ত প্রচলিত থাকবে। এটা সুস্পষ্ট, এর উদ্দেশ্য ছিলো, যে পর্যন্ত অন্য আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন না হয় মূসায়ী শরীয়তের ধারা চলতে থাকবে এবং এতে কেউ কোন পরিবর্তন করতে পারে না।

মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর জন্যে কুরআনে ব্যবহৃত 'কিয়ামত' শব্দ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর যুগের জন্যে কুরআন করীমে 'কিয়ামত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

লা উক্বসিমু বিইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ– ওয়ালা উক্বসিমু বিন্নাফসিল্লাওওয়ামাহ্ আইয়াহ্সাবুল ইনসানু আল্লান্নাজমা'আ 'ইয়ামাহ্– বালা ক্বাদিরীনা 'আলা

আন্ নুসাওবিয়া বানানাহ্– বাল ইউরীদুল ইনসানু লি ইয়াফজুরা আমামাহ্– ইয়াসয়ালু আইইয়ানা ইয়াউমুল ক্বিয়ামাহ্ ফাইযা বারিক্বাল বাসারু– ওয়া খাসাফাল ক্বামারু– ওয়া জুমিআশ্ শামসু ওয়াল ক্বামারু– ইয়াক্বুলুল ইনসানু ইয়াওমাইযিন আইনাল মাফার্ (সূরা ক্বিয়ামাহ্- ১ম রুকূ) ।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, কাফির যে দাবী করে, কিয়ামত বলতে কিছু নেই এবং মৃত পুনরায় জীবিত হবে না, এটা একেবারেই ভুল । আর আমরা এজন্যে সাক্ষ্যস্বরূপ কিয়ামত দিবস ও নফসে লওওয়ামাহ্ (আত্ম-তিরস্কারকারী আত্মা) উপস্থাপন করছি ।

এখন এখানে নিশ্চিতভাবে কিয়ামত দিবস অর্থ দুনিয়ার কোন ঘটনা । কেননা, কিয়ামত দিবস ও নফসে লওওয়ামাহ্ দুটোকে মৃতদের পুনরুত্থানের প্রসঙ্গে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে । 'কিয়ামত দিবস' বলতে দুনিয়ার ধ্বংসের পর কিয়ামত দিবস বুঝালে এ সাক্ষ্য অনর্থক হয়ে যায় । কেননা, যে বিষয় মরণের পর প্রকাশিত হবে তা দিয়ে এ দুনিয়ার লোক নিজেদের ঈমানের সংশোধনের কাজে কিভাবে উপকৃত হতে পারে? বিতর্ক তো এ কথা নিয়ে, মৃত কি তাহলে জীবিত হয়ে ওঠবে? আর আপত্তিকারীগণকে এই বলে বুঝ দেয়া হচ্ছে মৃতদের জীবিত হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কিভাবে সন্দেহ হতে পারে? 'কিয়ামত দিবস' তাদের জন্যে সাক্ষ্যস্বরূপ নয় কি? এ যুক্তিপ্রমাণ থেকে কোন্ মানুষ উপকৃত হতে পারে? যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন তো সব মানুষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে । সেক্ষেত্রে এ যুক্তি কার ঈমানের জন্যে কল্যাণজনক হবে? আপত্তি তো জীবিত মানুষদের । তাদের জন্য কল্যাণজনক যুক্তিপ্রমাণ তো সেটাই হতে পারে যা এ দুনিয়াতে প্রকাশিত হয় ।

অতএব এ স্থলে কিয়ামত দিবস দিয়ে এমনই কোন কিছু বুঝান দরকার যা এ দুনিয়াতে প্রকাশিতব্য ঘটনা হয়, যাতে কিয়ামতের অস্বীকারকারীদের ওপর এর মাধ্যমে হুজ্জত (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত)-ও হয়ে যায় । আর তাদের ঈমানের জন্যেও এ পথ উম্মুক্ত হয় । বিশ্বব্যাপী কিয়ামত দিবস তো সে সময়ে যুক্তিপ্রমাণ হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে যখন কোন কোন লোক কিয়ামত দিবসে এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে । তখন নি:সন্দেহে এ যুক্তিপ্রমাণ বোধগম্য হতে পারে । তোমরা মরে গিয়ে পুনরায় জীবিত হয়ে কি করে কিয়ামতকে অস্বীকার করতে পার । কিন্তু এ দুনিয়াতে এটা কোন ক্রমেও যুক্তি-প্রমাণে পরিণত হতে পারে না । অতএব যেসব লোক এ স্থলে কিয়ামতে কুবরা (মহাপ্রলয়) অর্থ মনে করে নেয় বা তারা কেবল একটি একক আয়াতের অর্থ

করে দেয় এবং তাদের এ উদ্দেশ্য নয় পারস্পরিক সম্পর্ককে মিলিয়েও এ আয়াতের অর্থ এটাই এবং হয়তো তারা পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি দেয় নি।

প্রকৃত কথা এই, এ পার্থিব একটি ঘটনা যা কিয়ামতে কুবরা-এর সত্যতার একটি প্রমাণ। 'নফসে লাওওয়ামাহ্'-এর সাথে মিলিয়ে একে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা মৃত্যুর পরের কিয়ামত এর অন্য একটি প্রমাণ। দুটি যুক্তি এজন্যে দেয়া হয়েছে যেন আপত্তি উত্থাপনকারীগণ বিভিন্ন যুগে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। অতএব প্রত্যেক যুগের লোকদের জন্যে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করে দেয়া হয়েছে যেন প্রত্যেকে এতে উপকৃত হতে পারে। যেমন, মক্কাবাসীদের সামনে কিয়ামতের প্রমাণ হিসেবে 'নফসে লওওয়ামাহ্' উপস্থাপন করা হয়েছে। আর শেষ যুগে কিয়ামতের অস্বীকারকারীগণের সামনে শেষ যুগের সেসব ঘটনা যা কিয়ামতে কুবরা-এর সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে কিয়ামত বলার যৌক্তিকতাসম্পন্ন সেগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, এর আরও সাক্ষ্য এ আয়াতে প্রতিপাদন করা হয়েছে– **ফা ইযা বারিকাল বাসারু-ওয়া খাসাফাল ক্বামারু– ওয়া জুমি'আশ্ শামসু ওয়াল ক্বামারু– ইয়াকূলুল ইনসানু ইয়াওমাইযিন আইনাল মাফার্** (সূরা ক্বিয়ামাহ্: ১ম রুকূ)।

যখন মানবীয় দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হবে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ দ্বারা অধিক কাজ নেয়া শূরু হবে এবং বস্তুর গঠন সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিস্কৃত হবে। আর চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে এবং সূর্যকেও এ কার্যক্রমে এর সাথে একীভূত করে দেয়া হবে। অর্থাৎ চন্দ্র গ্রহণের একই মাসে সূর্য গ্রহণও হবে। সে সময়ে মানুষ বলবে, এখন আমি কোথায় পালিয়ে যাবো?

যেভাবে উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয়, এসব আয়াতে এমন একটি যুগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন মানুষ খোদা-বিমুখ হয়ে যাবে। অর্থাৎ নাস্তিক্যবাদের প্রাধান্য হবে এবং খুব জোরে শোরে কিয়ামতকে অস্বীকার করা হবে। বাহ্যিক জ্ঞান খুবই উন্নতি লাভ করতে থাকবে। আর মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রাকৃতিক রহস্যাবলী অবহিত হওয়ার ব্যাপারে পারদর্শী হবে এবং চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ একই মাসে লাগবে।

এই আখেরী নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে হাদীসগুলোতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মজুদ আছে। এতে এ যুগ সম্পর্কে অধিক তথ্য জানা যায়। আর সেই হাদীস হলো এই রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, মাহদীর জন্যে এমন একটি নিদর্শন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যখন থেকে এ দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে

কোন মা'মুর মিনাল্লাহ্ (আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট)-এর জন্যে প্রদর্শিত হয়নি। আর তা এই। সেই যুগে একই রমযান মাসে চন্দ্রের গ্রহণ হওয়ার দিনগুলোর ১ম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যের গ্রহণ লাগার তারিখগুলোর মাঝের দিনে সূর্যে গ্রহণ লাগবে।

এ হাদীসের বিষয়-বস্তুর আলোকে যখন উপরোক্ত আয়াত দেখা যায় তখন সুস্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হয়, এ আয়াতে মাহদী মাসউদ (আ:)-এর উল্লেখ রয়েছে। আর তাঁর যুগকে কিয়ামত দিবস নির্ধারণ করে কিয়ামতে কুবরা-এর জন্যে অর্থাৎ 'যখন মৃত জীবিত হয়ে উঠবে'– একে একটি প্রমাণ ও নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিয়ামতে কুবরা-এর দুটি নিদর্শন

যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, কিয়ামতে কুবরা-এর জন্যে দুটি নিদর্শন নির্ধারণ করা হয়েছে। এক তো সেই কিয়ামত দিবস যখন দৃষ্টি প্রখর হয়ে যাবে এবং চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগবে। আর দ্বিতীয়টি হলো, **নাফসিল লওওয়ামাহ্**। **নাফসিল লওওয়ামাহ্র** সাক্ষ্য তো প্রত্যেক যুগেই লাভ হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগের লোক এতে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু এ বিশেষ কিয়ামত দিবসের সাক্ষ্যে সেসব লোকই লাভবান হতে পারে যারা শেষ যুগে অবস্থান করবে। এজন্যে উভয় যুগের লোকদের ঈমানের প্রবৃদ্ধির জন্যে দু প্রকার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বরং গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলে জানা যায়, এ সূরা বর্তমান যুগের ব্যাপারেই অধিক প্রযোজ্য। আর **নাফসিল লওওয়ামাহ্** এর প্রমাণ শেষ যুগের লোকদের সাথেই অধিক সম্পর্কিত। কেননা, এ যুগেই 'ইলমুন নফস' (মনোবিজ্ঞান) বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করেছে। মানবীয় বুদ্ধির কৃত্রিমতার প্রতি দৃষ্টি রেখে ভাল ও মন্দ কাজের সমস্যার ওপর খুবই বিস্তারিতভাবে বিতর্ক হয়েছে। আর এ যুগেই এ প্রমাণ অধিক কার্যকরী হতে পারে। আসলে কি ভাল ও কি মন্দ তা বিচার না করেই মানবীয় মগজে একটি বোধশক্তি রয়েছে যা কোন কোন বিষয়কে মন্দ ও কোন কোন বিষয়কে ভাল নির্ধারণ করে দেয়। কেবল এ বিষয়টি দেখা গেলে ভাল বা মন্দের অনুভূতি মানবীয় সত্তায় নিহিত আছে। আর (শরীয়তের) কোন কোন সীমারেখা ও নিয়ম-কানুন আবশ্যকীয় করে দিলেও এ বিষয় স্বীকার করতে হয়। মানুষ কোন না কোন রঙ্গে পুরস্কার ও শাস্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। এথেকে সে মুক্তি পেতে পারে না। আর এ অনুভূতি ও তার স্বভাবজ কারণ কিয়ামত দিবস ও মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের ওপর একটি শক্তিশালী সাক্ষী। চূড়ান্ত কোন হিসাব-নিকাশ না থাকলেও মানবীয়

স্বভাবে অনুশোচনা ও কোন ভাল জিনিষের জন্যে তা সামান্যই হোক না কেন চেষ্টার অনুভূতি কেন দেখা যায়?

এছাড়াও উপরোল্লিখিত আয়াতে মৃত্যুর পরের জীবনের সাক্ষ্য হিসেবে পার্থিব জীবন উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ইসলামের ওপর এক যুগে পুনরায় মৃত্যু আসবে যখন ইসলামের শিক্ষা তো জীবিত থাকবে কিন্তু মুসলমানগণ একে পরিত্যাগ করবে। সেই যুগে আল্লাহ্ তাআলা একজন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের গোলামের মাধ্যমে পুনরায় একে সঞ্জীবিত করবেন এবং এটা কিয়ামতের একটি শক্তিশালী প্রমাণ হবে। কেননা, খোদা ছাড়া এমন কে আছে যিনি তেরশ (বর্তমানে চৌদ্দশ) বছর পূর্বে ইসলামের প্রথম আবির্ভাবে, পুনরায় এর ওপর অধঃপতনের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া এবং পুনরায় দ্বিতীয়বার সেই যুগে জীবিত হওয়ার সংবাদ দিতে পারেন যখন চন্দ্র ও সূর্যে একটি বিশেষ মাসে দাবীকারকের উপস্থিতিতে গ্রহণ লাগবে, দুনিয়া বাহ্যিক জ্ঞানে ভরপুর থাকবে এবং নাস্তিক্যবাদের জয় জয়কার থাকবে? আর যখন কুরআন করীম বর্ণিত কিয়ামত তেরশ বছর পরে সংঘটিত হবে তখন এটা প্রমাণিত হবে, কুরআনের খোদা 'আলিমুল গায়েব (অদৃশ্য বিষয়াবলীর সর্বজ্ঞাতা)-ও বটেন এবং সর্বশক্তিমানও। তাহলে 'আলেমুল গায়েবের এ সংবাদকে লোকেরা কিভাবে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারে যা মৃত্যুর পরে সংঘটিত হবে? এবং সেই সর্বশক্তিমান খোদার শক্তি ও মহিমা দেখে কিয়ামতের অস্তিত্বকে কিভাবে অসম্ভব বলে নির্ধারণ করতে পারে? তাই যখন প্রথম কিয়ামতের বিকাশ ঘটবে তখন বুদ্ধিমান লোকেরা বলবে, এখন পালাবার কোন স্থান নেই। অর্থাৎ এ যুক্তিপ্রমাণ পূর্ণ হতে দেখার পরেও কোন জ্ঞানী ব্যক্তি একটি শক্তিশালী সত্তাকে অস্বীকার করতে পারবে না, যাঁর করতলে সব বিশ্ব-রহস্য অবস্থান করছে এবং যাঁর শক্তি আছে, তিনি যা চান তাই করবেন এবং তিনি 'আলিমুল গায়েব যাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন জিনিস নেই।

প্রত্যেক নূতন নবীর যুগে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টির ওপর মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর সাক্ষ্য

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামও তাঁর 'আয়নায়ে কামালতে' ইসলাম পুস্তকের ৫৬৬ পৃষ্ঠায় লেখেন– ওয়া উলক্কিয়া ফি ক্বালবী আন্নাল্লাহা ইযা আরাদা আঁইয়াখলুক্বা আদামা ফাইয়াখলুক্বুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযা ফী সিত্তাতি আইইয়ামিঁওয়া ইয়াখলুক্ব কুল্লা মালা বুদ্দা মিনহু ফীসসামায়ি ওয়াল আরযীনা সুম্মা ফী আখিরিল ইয়াওমিস্ সাদিসি ইয়াখলুক্ব আদামা ওয়া কাযালিকা জারাত 'আদাতুহূ ফীল আওওয়ালীনা ওয়া আখিরীন।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা আমার অন্তরে এ কথা অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা যখনই আদমকে সৃষ্টি করতে চান তখন আকাশ ও পৃথিবী ছয় সময়-কালে সৃষ্টি করেন। আর প্রত্যেক প্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তুকে আকাশ ও পৃথিবীতে তৈরী করেন। পুনরায় ষষ্ঠ দিনের শেষে আদমকে সৃষ্টি করেন। এবং আল্লাহ্র এ সুন্নতই প্রাথমিক যুগে ছিলো এবং শেষ যুগেও এরূপই করবেন।

এতে জানা যায়, প্রত্যেক সম্মানিত নবীর যুগে একটি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করা হয় যেন আধ্যাত্মিকভাবে দুনিয়াকে বদলিয়ে দেয়া হয় এবং পূর্বের ব্যবস্থাপনার ওপর ধ্বংস নেমে এসে এক আধ্যাত্মিক কিয়ামতের মাধ্যমে দুনিয়াকে একটি নবজীবন দান করে যায়।

হযরত মসীহে মাওউদ (আ:)-এর একটি কাশ্ফ

হযরত মসীহে মাওউদ (আ:)-এর একটি কাশ্ফ (দিব্যদর্শন) রয়েছে। এতে তিনি দেখেন, 'আল্লাহ্ তাআলার মাঝে আমি নিমজ্জিত হয়ে গেছি এবং এ অবস্থায় আমি বলছিলাম, আমরা একটি নুতন ব্যবস্থাপনা এবং নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী চাচ্ছি। তাই আমি প্রথমেতো আকাশ ও পৃথিবী একাকার আকৃতিতে সৃষ্টি করি। এতে কোন বিন্যাস ও পার্থক্য ছিলো না। পুনরায় আমি ঐশী প্রত্যাশা অনুযায়ী এর বিন্যাস ও পার্থক্য করি এবং আমি দেখছিলাম, আমি এসব সৃষ্টিতে সর্বশক্তিমান। পুনরায় আমি পৃথিবীর আকাশ সৃষ্টি করলাম এবং বল্লাম, *ইন্না যাইয়ান্নাস সামায়াদ্ দুন্ইয়া বিমাসাবীহা* (নিশ্চয় আমরা দুনিয়ার আকাশ প্রদীপমালা দিয়ে সজ্জিত করেছি– অনুবাদক)। পরে আমি বল্লাম, এখন আমরা মাটির সার পদার্থ দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করবো। পুনরায় আমার কাশ্ফের অবস্থা ইলহামের দিকে পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং আমার মুখে একথা জারী হলো– *আরাদতু আন আসতাখলীফা ফাখালাক্বতু আদাম– ইন্না খালাক্বনাল ইনসানা ফী আহসানি তাক্বীম* (কিতাবুল বারিয়্যা, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯)।

(অর্থ : আমি আমার প্রতিনিধি বানাতে চাইলাম তাই আমি আদম সৃষ্টি করলাম। নিশ্চয় আমরা উত্তম উপকরণাদি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছি– অনুবাদক)।

প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ কার্যক্রম হয়ে থাকে। এ কাশ্ফেও তা প্রতীয়মান হয়। আর তিনি এমন একটি পরিবর্তন সাধন করতে আগমন করেন যা পূর্বতন ব্যবস্থাপনার তুলনায় নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ বলে আখ্যায়িত করার যোগ্য হয়। অবশ্যই যখন নতুন শরীয়ত (বিধান) আসে তখন একে পূর্বতন শরীয়তের তুলনায় নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ বলা হয়। কেননা, তা 'খায়রুম মিনহা'

(তা থেকে উত্তম –অনুবাদক) হয়ে থাকে। আর যদি পূর্ববতী শরীয়তের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোন নবী আগমন করেন তাহলে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কেবল এটা হয়ে থাকে, তাঁর যুগে দুনিয়াতে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকে তা বিনাশ করে পুনরায় নতুনভাবে ধর্মের প্রকৃত শাসন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেসব অর্থেই তিনি একটি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী নির্মাণ করেন অর্থাৎ যেভাবে তিনি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেন যেন তা পুরাতনই কিন্তু দুনিয়ার দৃষ্টিতে তা নতুন প্রতীয়মান হয়। কেননা, সেই যুগে তা দুনিয়া থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে এবং সে জায়গায় অন্য কোন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ এর বড় বড় পর্যায় কী কী?

এ ভূমিকা রাখার পর পার্থিব সংস্কৃতি ও সভ্যতার পর্যায়সমূহের তুলনায় ঐশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে তা কী ছিলো তা আমি বলতে চাই। সুতরাং মনে রাখা উচিত:

আদমের যুগের বাণী

কুরআন করীম থেকে জানা যায়, বর্তমান মানব প্রজন্মের সবচেয়ে প্রথম পর্যায় ছিলো আদমের। কুরআন করীমে হযরত আদম আলায়হেস্ সালামের ব্যাপারে এসেছে– **ওয়া ইয ক্বলা রব্বুকা লিল মালাইকাতি ইন্নী জা'ইলুন ফিল্ আরযি খলীফাহ্– ক্বালূ আতাজ'আলু ফীহা মাঁইউফসিদু ফীহা ওয়া ইয়াসফিকুদ্ দিমায়া**।

[অর্থাৎ এবং (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন ফিরিশ্তাদের বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) বানাতে যাচ্ছি। তারা অর্থাৎ (ফিরিশ্তারা) বল্লো, তুমি কি এতে এমন কাউকে নিযুক্ত করবে যে এতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? (সূরা বাকারা : ৩১ আয়াতাংশ]

এথেকে প্রতীয়মান হয়, আদম সেই প্রথম নবী যিনি সমাজ-জীবনের ভিত্তি রেখেছিলেন এবং নেযাম ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এস্থলে আদম বলতে সেই আদম নয় যার মাধ্যমে মানুষের প্রজন্ম শুরু হয়েছিলো বরং এখানে আদম বলতে সেই আদমকে বুঝাচ্ছে যার মাধ্যমে সমাজ জীবন, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার সূচনা হয়েছিলো। অর্থাৎ এর আগে মানুষ সমাজ জীবনের সেই স্তরে পৌঁছেনি যা শরীয়ত বা বিধান বহন করতে পারতো। বরং তখন সেই সংস্কৃতি ও কৃষ্টির জন্ম হয়নি। আর মানুষ নামে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করেনি। একে কেবল উন্নত ধরনের জীব বলা যেতে পারতো। বানর থেকে মানব সৃষ্টি হয়েছে, আমি এ কথায় বিশ্বাসী নই। আল্লাহ্র ফযলে আমি এ মতবাদকে ভুল প্রমাণিত করতে পারি।

মানুষের জন্ম স্থায়ী বিবর্তনের মাধ্যমে হয়েছে

কিন্তু এটাও সত্য কথা, মানুষের উন্নতি বিবর্তনের নীতি অনুযায়ী সাধিত হয়েছে। সেই সময়ে মানুষের এমনই অবস্থা ছিলো যেভাবে একটি শিশুর অবস্থা থাকে। এখন যদি কেউ চার বছরের শিশুকে বলে, রোযা রাখো তাহলে এতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে পাগল মনে করবে। এভাবেই প্রাথমিক কালের মানুষদের অবস্থা এ রকম ছিলো। শরীয়তের বোঝা বহন করতে পারে তারা তখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি।

প্রাথমিক পর্যায়ের তাৎপর্য

অতএব মানুষের ওপর এমন একটি যুগ এসেছে, যখন তাকে মানুষ তো বলাই হতো ঠিকই কিন্তু তখনও সে স্থায়ী জীবন (পরকালের জীবনসহ) লাভের যোগ্যতা লাভ করেনি। এ অবস্থা থেকে যখন সে উন্নতি লাভ করলো এবং তার মস্তিষ্ক শরীয়তের বোঝা বহন করার যোগ্যতা অর্জন করলো তখন প্রথমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিধান অবতীর্ণ হলো তা ছিল এই, মিলে মিশে থাকো এবং একজন নেতার অধীনে নিজেদের জীবন নির্বাহ করো। মোটকথা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রথম বিধান বহনকারী সাদা-সিদে ঐশী ইবাদত ছাড়াও এই বাণী নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তোমরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করো। তোমাদের একজন শাসক থাকা বাঞ্ছনীয়। তাকে তোমাদের মান্য করা উচিত। তোমরা তোমাদের মামলা মোকদ্দামা তার কাছে উপস্থাপন করো। তাকে দিয়ে তোমাদের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করাও এবং প্রত্যেক কাজ নিয়মের মাধ্যমে কর। আর সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করলেন তাঁর নামই ছিলো আদম।

আমরা এ দৃষ্টি-ভঙ্গিতে যখন আদমকে দেখি তখন সেসব অভিযোগের মীমাংসা হয়ে যায় যা এর আগে আদমের ঘটনার ওপর করা হতো। যেমন এই যে বলা হয়, ফিরিশ্‌তারা বল্লো, **আতাজ'আলু ফীহা মাইউফসিদু ফীহা ওয়া ইয়াসফিকুদ্দিমায়া**– তুমি কি পৃথিবীতে এমন ব্যক্তিদের দন্ডায়মান করতে যাচ্ছ যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও লোকদের রক্ত প্রবাহিত করবে? এর ওপর এ আপত্তি তখন উত্থাপন করা হয় যখন আদমের জন্মই হয় নি। আদমের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত হবে ফিরিশ্‌তারা তা কিভাবে জানতে পারলো?

এর কয়েকটি জবাব দেয়া হতো। যেমন এই, যেহেতু শাসক ঝগড়া-ফাসাদ দূর করার জন্যেই হবে তাই ফিরিশতারা বুঝে ফেল্ল অবশ্যই কোন ঝগড়া-ফাসাদকারীও সৃষ্টি হবে। এজন্যে তারা আল্লাহ্‌র সামনে এ প্রশ্ন উপস্থাপন

করলো, দুনিয়াতে কি ঝগড়া-ফাসাদকারীও সৃষ্টি হবে যাদের সীমার মাঝে রাখার জন্যে আদমকে সৃষ্টি করা আবশ্যক?

নি:সন্দেহে 'খলীফা' শব্দ দিয়ে এ ইস্তিমবাত ও অনুসিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যেতে পারে। কোন এমন সৃষ্টিও হবে যারা ঝগড়া-ফাসাদও করবে। কিন্তু এ আদম মানব প্রজন্মের প্রথম মানুষটি হলে এ প্রশ্নও অবশ্যই উঠতো, ঝগড়া-ফাসাদ তো ভবিষ্যতে আদম সন্তান কর্তৃক করারই ছিলো তাই আদমকে কী উদ্দেশ্যে এবং কী কাজে খলীফা বানানো হয়েছিলো? আর খলীফার সত্তা ঝগড়া-ফাসাদের অবর্তমানেও হতে পারলে ফিরিশ্তাদের আপত্তির ভিত্তি কি ছিলো?

মোটকথা এ ব্যাখ্যা থেকে, যা মোটেই অযৌক্তিক নয়, এ প্রশ্নের জবাব বের হয়, ফিরিশ্তাদের এ ধারণা কেন সৃষ্টি হলো? এতে এ আয়াতের একটি অর্থ বলা যেতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ অর্থ বলা যেতে পারে না।

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, এর অর্থ এই, ফিরিশ্তারা বল্লো, তুমি আদমের মাঝে যে শক্তি রেখেছো এগুলোর মাধ্যমে আমাদের এ সন্দেহ সৃষ্টি হয়, সে অবশ্যই ফিতনা-ফাসাদ করবে এবং মানুষের রক্তপাত করবে। যদিও আদম খোদার নবী ছিলেন তাই তাঁর এমন কিছুই করার ছিলো যা খোদা তাআলা তাকে আদেশ দিয়ে থাকতেন। এর বিরুদ্ধে কোন কর্মকান্ড তিনি করতেই পারতেন না।

এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে এ বিষয় স্মরণ রাখা উচিত, ভাষা-ভাষা দৃষ্টিতে এথেকে এ ইস্তিমবাত বা অনুসিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যেতে পারে, যে কাজকে ফিরিশ্তা অদ্ভূত মনে করে থাকে তা কি স্বয়ং আদমের কাজ না অন্য কোন ব্যক্তির? কেননা, তারা বলে তুমি কি দুনিয়াতে এমন সত্তা সৃষ্টি করতে যাচ্ছো যা ঝগড়া-ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর শব্দাবলী থেকে দ্বিতীয় বিষয় এটা প্রকাশিত হয়, এ ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তপাত স্বয়ং খিলাফতের তাৎপর্য থেকেই প্রকাশিত হয়। আর তা এই, যে ঝগড়া-ফাসাদের প্রতি ফিরিশ্তা ইঙ্গিত করছে তা এমন কোন কর্ম যা খলীফা বানানোর সাথে সম্পৃক্ত। মোটকথা ফিরিশ্তারা আল্লাহ্ তাআলার কথা থেকেই এটা ধারণা করে নিয়েছিলেন, খোদা তাআলা আদমকে দিয়ে এমন কোন কাজ করাবেন যা বাহ্যত ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তপাত হিসেবে প্রতীয়মান হবে। এতে তারা বিস্ময় প্রকাশ করে, খোদার খলীফা ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তপাতের অপরাধে অপরাধী? এটা কেমন আশ্চর্যজনক কথা!

প্রশ্নের এ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখ আদমের যে মকাম-মর্যাদা আমি বর্ণনা করেছি এর সাথে সেই প্রশ্ন পূর্ণভাবে সমন্বয় সাধন করে। আমি বলেছি,

যে আদমের বর্ণনা সূরা বাকারায় এসেছে তিনি মানব প্রজন্মের আদি পিতা নন বরং শরীয়তের এমনধারায় প্রথম পর্যায়ের ভিত্তি স্থাপনকারী। আর যেভাবে কুরআন থেকে ইস্তিমবাত বা অনুসিদ্ধান্ত নির্ণয় করে আমি বলেছি– সেই যুগ ছিলো সভ্যতা-সংস্কৃতির যুগ। অর্থাৎ এ যুগে প্রথম বারের মত সভ্যতা-সংস্কৃতিকে দুনিয়াতে পরিচিত করানো হয়েছিলো। আদমের পূর্বে মানুষ সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নেযাম বা ব্যবস্থাপনার জোয়াল নিজ কাঁধে বহন করার যোগ্যতা রাখতো না। কিন্তু এ সময়ে যেহেতু মানুষের মাঝে এ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেলো আল্লাহ্ তাআলা সেই যুগের সংশোধনী সত্তাকে নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত করে সভ্যতা-সংস্কৃতির যুগের প্রবর্তক বানিয়ে দিলেন। তাঁকে আদেশ জারী করার আদেশ দিলেন। এ যুগেই নারী ও নরের বিবাহ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতির ওপর আত্মীয়তার বন্ধনের রীতি-নীতি প্রবর্তন করা হয়। নচেৎ যেভাবে পরিদৃষ্ট হয়, এর পূর্বে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির কায়দা-কানুন মেনে চলার যেহেতু শক্তি ছিলো না সেহেতু সেই সময় পর্যন্ত বিয়ের বন্ধনের ব্যাপারেও কোন নীতি নির্ধারিত ছিলো না।

আদম সৃষ্টির ওপর ফিরিশ্তাগণের প্রশ্নের কারণ

এ কথাটি ভালভাবে বুঝে নেয়ার পর ফিরিশ্তাগণের প্রশ্নের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ সভ্যতার ব্যবস্থাপনা না থাকে ততক্ষণ সব রকমের হত্যা ও ধ্বংস একটি মন্দ রূপ পরিগ্রহ করে ও পাপ বলে আখ্যায়িত হয়। কিন্তু যখনই শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কয়েক প্রকার যুদ্ধ ও হত্যা সিদ্ধ ও সঠিক বলে গণ্য হয়। যেমন, যে লোক শাসন-ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য করে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আইনানুগ মনে করা হয়। যে-ব্যক্তি ঝগড়া-ফাসাদ করে তাকে হত্যা করা সিদ্ধ বলে মনে করা হয়। আর সব শাসন-কর্তা এরূপ করেন বরং এরূপ করতে বাধ্য হন।

অতএব আল্লাহ্ তাআলা যখন পৃথিবীতে আদমকে খলীফা বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন ফিরিশ্তারা শাসন কর্মের সব দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাদের কাছে এ নতুন বিষয়টি উদ্ভাসিত হলো, হত্যা, রক্তপাত এবং যুদ্ধেরও একটি সিদ্ধ রূপ আছে এবং কখনো কখনো আদম কর্তৃক এ কর্ম সংঘটিত হবে এবং খোদা তাআলার দৃষ্টিতে তার এ কর্ম পছন্দনীয় মনে করা হবে, অপছন্দনীয় মনে করে হবে না? আর যেহেতু ইতোপূর্বে শাসন-ব্যবস্থার কোন দৃষ্টান্ত ছিলো না এ বিষয়টি ফিরিশ্তাগণের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিলো এভাবেই, যেভাবে কোন কোন লোকের কাছে পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকে না। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুদ্ধসমূহের ওপর আপত্তি করা

হয় বা কোন কোন হত্যার শাস্তির ওপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়। অতএব ফিরিশ্‌তাগণের প্রশ্ন ছিলো আদমের কর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারেই যা তিনি সময়ের শাসক হিসেবে পালন করেছিলেন। আর তাদের কাছে এ বিষয় আশ্চর্য বলে মনে হয়েছিলো সেই কাজ অর্থাৎ যুদ্ধ এবং হত্যা যা ইতোপূর্বে পাপ বলে মনে করা হতো এখন একে কোন কোন অবস্থায় সিদ্ধ মনে করা হবে! তাই তারা বলে, হে খোদা! আপনি এমন একজন খলীফা বানাতে যাচ্ছেন এবং সেসব কাজ তার স্কন্ধে অর্পণ করছেন যা পূর্বে অবৈধ ছিলো। আল্লাহ্ তাআলা তাদের জবাব দেন– **ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামূন**– তোমরা জানো না, এ ব্যবস্থাপনার মাঝে কী সৌন্দর্য রয়েছে। যদিও বাহ্যত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কয়েক প্রকার শক্তি প্রয়োগের অনুমতি রয়েছে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্ত ক্ষেপও হয়। কিন্তু সামগ্রিকতার দৃষ্টিতে এ শক্তি প্রয়োগ ও নিয়ম-কানুন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এবং জাতির ক্ষেত্রেও কল্যাণপ্রদ।

এটা সুস্পষ্ট, আমি যে অর্থ করেছি একে দৃষ্টিপটে রাখলে **ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন** বাক্যটি উদ্ধৃতিতে খুবই উত্তমভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। আর অন্যান্য অর্থের আলোকে এতে বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায় বা কমপক্ষে সেই অর্থ একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

সভ্যতা-সংস্কৃতির তাৎপর্য

এটাও সুস্পষ্ট, পৃথিবীতে সভ্যতা-সংস্কৃতির অর্থই এই, যেন হত্যা এবং ঝগড়া-ফাসাদেও কোন কোন বৈধ অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। যেমন দেখে নাও যায়েদ হত্যা করে এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে সে হত্যাকারী বলে বিবেচিত। কিন্তু সেই যায়েদকেই সরকার যখন ফাঁসী দেয় তখন সরকার হত্যাকারী বিবেচিত হয় না বরং তার কর্মকান্ড বৈধ এবং প্রশংসা বলে বিবেচিত হয়।

এমনিভাবে কোন লোক কারও বাড়ী বা সম্পত্তি দখল করে নিলে সবাই বলবে সে কলহপরায়ণ। কিন্তু সরকার দেশের প্রয়োজনের তাগিদে সম্পত্তি দখল করে নিলে এ কর্ম লোকদের দৃষ্টিতে বৈধ বলে মনে হয়।

এভাবে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আবদ্ধ করে রাখলে তা নির্যাতন বলে আখ্যায়িত হয়। কিন্তু সরকার কাউকে নজরবন্দী (গৃহে অন্তরীণ) করে রাখলে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে তখন এটা বৈধ এবং প্রয়োজনীয় মনে করা হয়।

অতএব খোদা তাআলা যখন বল্লেন, আমরা দুনিয়াকে সভ্য-সংস্কৃতিবান বানাতে চাই এবং আমরা এক ব্যক্তিকে আমাদের খলীফা বানাতে চাই। সে আইন-কানুন

প্রয়োগ করবে। সে আইনের মাধ্যমে কোন কোন লোককে হত্যার শাস্তি প্রদান করবে। সে আইনের মাধ্যমে কোন কোন লোকের সম্পত্তির ওপর শক্তিপ্রয়োগ করে দখল নিয়ে নেবে। সে আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে। যেহেতু এটা সর্বৈব একটা নতুন বিষয় ছিলো তাই ফিরিশ্‌তারা আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং তারা বিচলিত হয়ে পড়লেন। ইতোপূর্বে হত্যা করাতো অবৈধ বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন এক প্রকার হত্যা বৈধ হয়ে যাবে? এর পূর্বে ঝগড়া-ফাসাদ করা অবৈধ নির্ধারণ করা হয়েছিলো। কিন্তু এখন এক প্রকার ঝগড়া-ফাসাদ বৈধ হয়ে যাবে?

এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন কালের প্রেক্ষাপটে লোকদের জন্যে নেহায়েতই গুরুত্ব বহন করতো বরং এ আপত্তি আজও দুনিয়াতে উত্থিত হচ্ছে। যেমন, ইউরোপে একটি বিশেষ সংখ্যার লোক এমন আছে যারা ফাঁসীর শাস্তির বিরোধিতা করে। আর তারা এর এই যুক্তি দেয়, কাউকে যখন হত্যা করা অবৈধ তখন সরকার কেন কাউকে হত্যা করবে? যদিও সরকার কেবল ফাঁসীই দেয় না এবং কোন প্রকার কর্ম যা কোন কোন পাপের সাথে সাদৃশ্য রাখে তা সরকারও করে থাকে। যেমন ট্যাক্স আদায় করে। আর আগে বর্ণিত ধারণা ঠিক হয়ে থাকলে এটাও বলতে হবে, ট্যাক্স আদায় করা যেহেতু চুরি ডাকাতির অনুরূপ এ-ও পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু এসব লোক ট্যাক্সের ওপর আপত্তি তোলে না। অতএব জানা গেল, সেসব লোকদের ফাঁসীর ওপর আপত্তি কেবল একটি খেয়াল এবং দূরদর্শিতার অভাবের ফল।

প্রাথমিককালে যেহেতু তখনও শাসন-ব্যবস্থার পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি, দুনিয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে ছিল এজন্যে কোন ব্যক্তি কাউকে যখন মেরে ফেলতো তখন মনে করা হতো সে বড়ই মন্দ কাজ করেছে। কারও ধন-সম্পদ যখন লুটপাট করতো তখন প্রত্যেকেই বলতো, এ ব্যক্তি খুবই খারাপ আচরণ করেছে। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তাআলা শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং এ আইন প্রচলিত হলো, যে-ব্যক্তি কাউক হত্যা করবে, তাকেও হত্যা করা হবে। তখন লোকেরা বিস্মিত হলো এবং তারা বল্লো, এটা কী হলো? একজনের জন্যে হত্যা করা বৈধ আর একজনের জন্যে হত্যা করা বৈধ নয়। একজনের জন্যে লুটপাট করা বৈধ আর অন্যের জন্যে লুটপাট বৈধ নয়। সরকারের জন্যে ট্যাক্স আদায় করা বৈধ হবে আর অন্য কোন লোক শক্তি প্রয়োগ করে কারও পয়সা উঠিয়ে নিলে তা অবৈধ বলা হবে?

যেমন সেসব কর্ম যাকে খারাপ মনে করা হতো ওগুলো যখন সরকার করে তখন এর নাম সভ্যতা-সংস্কৃতি রাখা হয়। আর কেউ এটা খারাপ মনে করে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি সেই কর্ম করলে তা খারাপ মনে করা হয়।

সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ওপর আপত্তিসমূহ

তাই আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশ্তাদের যখন বল্লেন, এখন দুনিয়াতে নেযাম ও ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন হতে যাচ্ছে তখন তারা খুবই বিস্মিত হলেন এবং তারা মনে করলেন, সেই নতুন নিয়মের মাধ্যমে আদম মানুষ হত্যা করলে বলা হবে এটা বড়ই পুণ্যের কাজ। আদম মানুষের কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে ট্যাক্স আদায় করলে বলা হবে, এ ব্যক্তি বড়ই সম্ভ্রান্ত। এটা এক আশ্চর্য রকমের দর্শন।

আজ আমরা এ প্রশ্নের তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝতে পারি না। কিন্তু এ নিয়ম যখন নতুন নতুন প্রবর্তিত হয়েছিল লোকেরা তখন খুবই বিস্মিত হয়ে থাকবে। এখনও যেভাবে আমি বলেছি, এমন লোকের সন্ধান মিলবে, যারা এ নিয়মের ওপর আপত্তি তুলবে। যেমন, বন্য গোত্রের লোকরা এখন পর্যন্ত বলে, সরকার কেন হত্যা করে? আমাদের মাঝ থেকে কোন ব্যক্তি আমাদের কাউকে হত্যা করলে আমরা নিজেরা তাকে হত্যা করবো। সরকারের মাঝখান থেকে অযথা নাক গলানোর কি দরকার? আর যতক্ষণ প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ততক্ষণ তাদের তৃপ্তি হয় না। মানবীয় মস্তিষ্কের প্রাথমিক অবস্থা ছিলো এ রকমই। আর বুদ্ধি-জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আজও কোন কোন লোকের মাঝে এটা সৃষ্টি হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত কথা এই, ফিরিশ্তা এর ওপর আপত্তি তোলে না যে, আদমের বংশধর জন্মগ্রহণ করলে পর হত্যা ও রক্তপাত হবে বরং এর ওপর আপত্তি তোলে যে মানুষের ওপর এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হবে, যে এসব মন্দ কাজ করবে। আর তার এসব কর্মকে সিদ্ধ বলে নির্ণয় করা হবে।

এটা এমন একটি মানসিক বিপ্লব ছিলো যে, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এ দেখে জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়ে থাকবে। আর লোকদের কাছে এটা স্বীকার করা যে, এক ব্যক্তি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার ধন-সম্পদ করায়ত্ত করবে এবং তাদের মাঝে কোন কোন লোককে ফাঁসী পর্যন্ত দিতে পারবে অথচ তার এ কর্ম সিদ্ধ বলে মেনে নিতে হবে, এটা খুবই কঠিন ও কষ্টদায়ক কাজ বলে মনে হয়ে থাকবে। সে হয়ত বলতো, আমরা এক ব্যক্তিকে মেরে ফেলেছি এটা আমাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখে। তারা জানে আর আমরা জানি কিভাবে ব্যাপারটি সুরাহা হবে। মাঝখানে এ ব্যক্তি হুমকি-ধমকি দেবার কে? যেমন, আজকালও প্রতিবন্ধী লোকেরা সেসব ধারণায় নিপতিত এবং এসব লোকদের জন্যে সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়। যেমন, বেলজিয়ামে তো সম্ভবত ফাঁসীর শাস্তি উঠিয়েই দিয়েছে। আর তারা কেবল এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা আমি বলে এসেছি।

সেসব লোক যাদের কথায় ফাঁসীর শাস্তি রদ করা হয়েছে, তারা আমার সামনে থাকলে আমি তাদের জিজ্ঞেস করতাম, ফাঁসির শাস্তি তো তোমরা মিটিয়ে দিলে কিন্তু ট্যাক্সের পদ্ধতি কেন উঠিয়ে দিলে না। এ-ও তো অন্যের সম্পত্তিতে অবৈধ দখলের শামিল।

আসল কথা এই, ইউরোপবাসীর মন-মস্তিষ্কে যে অধঃপতন শুরু হয়েছে এ ধরনের ধ্যান-ধারণা সেই কথারই সাক্ষ্য বহন করে । আর প্রকৃতপক্ষে সরকারী কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি এসব প্রতিবন্ধী লোকদের কারণেই হয়ে থাকে। পার্থক্য কেবল এই, এখন যেহেতু সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, এখন এ ধারণা তো সৃষ্টি হয় না যে, একেবারে সরকার উৎখাত করে দেয়া হোক। অবশ্য এখন এ ধারণার সৃষ্টি হয়, এ সরকারের স্থলে অন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের স্বার্থ অধিক সংরক্ষিত হবে এবং এর জন্যে (সরকার) পরিবর্তনের চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু অসভ্য জাতির অবস্থা এখনও এই যে, তারা সরকার ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, যেকোন রঙ্গেই হোক না কেন অপছন্দ করে থাকে। একে বরদাশ্‌ত করা তাদের জন্যে বড়ই কঠিন ও মুশকিলের কাজ। তারা অন্যের হস্তক্ষেপের ব্যাপারটিতে খুবই বিচলিত হয়। যেমন, তাদের নগ্নভাবে চলা ফেরাতে যদি সরকার আপত্তি তোলে তাহলে তারা বলে, আমরা নগ্নভাবে চলাফেরা করলে তাতে কার বাবার কী যে আমাদের কাপড় পড়তে বাধ্য করে? আমরা নগ্ন শরীরে থাকলে আমাদের গায়ে হাওয়া বাতাস লাগে এবং আমাদের আনন্দ লাগে। আমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে কেউ নাক গলাক আমরা এটা বরদাশ্‌ত করতে পারি না।

যেমন, বৃটিশ কর্তৃক দখলের প্রাথমিক দিকে আফ্রিকার শহরগুলোতে যখন হাবশীরা উলঙ্গ অবস্থায় প্রবেশ করতে আসতো তখন শহরের সিংহদরজায় সরকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত হতো। তারা তাদেরকে লুঙ্গি দিতো এবং বলতো লুঙ্গি পরে শহরে যেতে পারো, উলঙ্গ যেতে পারবে না। তারা লুঙ্গিতো পরতো কিন্তু এধার ওধার দেখতে দেখতে যেতে থাকতো কোন হাবশী আবার তাদের এ বেহায়াপনা দেখে ফেল্ল নাকি! আর তারা যখন একে অপরকে দেখতো তখন (লজ্জায়) চোখ বন্ধ করে ফেলতো এই ভেবে, এ রকম বেহায়াপনা আমাদের মাধ্যমে হওয়া উচিত নয়। পরে আবার শহর থেকে যখন বের হয়ে আসতো তখন তাড়াতাড়ি করে লুঙ্গি খুলে কর্মকর্তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সরে পড়তো।

বরং এখন তো ইউরোপে কোন কোন লোক এমন সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা উলঙ্গ থাকে। আর অন্যদেরও উলঙ্গ থাকার জন্যে নির্দেশ দেয়। বরং একবার তো একথা নিয়ে সংঘর্ষ হয়ে গেছে। তারা চাপ প্রয়োগ করতে থাকলো, আমরা উলঙ্গ

শরীরে শহরে প্রবেশ করতে চাই। আর পুলিশ বললো, না, কাপড় পরে আসো। তারা বল্লো, তোমরা কারা, আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাও? তোমরা চোখ বন্ধ করে নাও। আমাদের দিকে তাকিও না। কিন্তু তোমরা আমাদের কাপড় পরতে বাধ্য করছো কেন? পরিশেষে ঝগড়া যখন বেড়ে গেলো তখন পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হলো।

এটাও ইউরোপের পতনের একটি চিহ্ন। এখন সেখানে এক শ্রেণীর লোকের বোধশক্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে গেছে। ইউরোপে কোন কোন ক্লাব এমন আছে, যারা কাপড় পরে গোসল করে তারা কোনক্রমেই সেখানকার সদস্য হতে পারে না। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে এখনও সেই ব্যক্তি পুরোপুর সংস্কৃতিমনা হতে পারে নি।

আমি এ প্রসঙ্গে একখানা পুস্তকও পাঠ করেছি। এতে একজন ডাক্তার লিখেছেন। আমার মেয়ে নগ্ন সমিতির (Nude Society) সদস্য হয়ে গেছে। এ কথা আমাকে কঠিন পীড়া দিতো। আর আমি তার ওপর কঠোরতা শুরু করলাম। পরিশেষে একদিন আমার মেয়ে আমাকে বল্লো, আব্বু! একদিন গিয়ে দেখা তো যাদের তোমরা অসভ্য বলছো তারা কতো সভ্য এবং ভদ্রলোক। সুতরাং তিনি লেখেন, একদিন আমার মেয়ে আমাকে জোর করে সেই সমিতিতে নিয়ে গেলো। আমি সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন আমি দেখলাম সবাই নগ্ন দেহে ঘোরা ফিরা করছে। এটা দেখে প্রথমতো লজ্জায় আমার মাটির সাথে মিশে যাওয়ার উপক্রম হলো। কিন্তু পরে আমি দেখলাম তাদের চেহারায় এতই অকপটতার ছাপ ছিলো যে, এর কোন সীমা নেই। সুতরাং এটা দেখে আমার ধারণাও পাল্টিয়ে গেলো। আমিও কাপড় ফেলে তাদের ভীড়ে মিশে গেলাম। মোদ্দা কথা, আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম আলায়হেস সালামের মাধ্যমে প্রথম বার মানব প্রজন্মের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করলেন আর বল্লেন, তোমাদের কোন কোন লোক অযথা নগ্নভাবে চলা ফেরা করায় বিশ্বাসী হবে। কিন্তু আমরা তাদের নগ্নভাবে চলাফেরা করতে দেবা না। যেন মানবীয় স্বাধীনতার ওপর আদম কোন কোন বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে দিলেন এবং তাদের একটি আইনের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন।

সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুশাসনের কল্যাণরাজি

আপনারা আজ এসব কথা সাধারণ মনে করেন এবং এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেন। কিন্তু প্রথম প্রথম আদম যখন এ কথা সব লোকদের সামনে উপস্থাপন করে থাকবেন, জাতির পর জাতি আদমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকবে। আদম

যখন তাদের বলে থাকবেন কাপড় পরিধান করো তখন কোন কোন গোত্র বিদ্রোহ করে থাকবে এবং তারা এটা বলা আরম্ভ করে দিয়ে থাকবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার খাতিরে দন্ডায়মান হয়ে যাও। এ জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা আদম ও তাঁর সঙ্গীগণকে সেসব যুক্তি-প্রমাণ শিখান। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, হে আদম! লোকেরা যখন আপত্তি উত্থাপন করে এবং বলে এ সভ্যতা-সংস্কৃতিভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থায় কী লাভ? তখন তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা এ ঐশী-ব্যবস্থার অধীনে থাকলে অভুক্ত থাকবে না, নগ্ন থাকবে না, পিপাসার্ত থাকবে না এবং রৌদ্রে তোমাদের কষ্ট করতে হবে না। আর এটাই ধর্ম-ভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থায় অপরিহার্য। এটা দেশে মঙ্গলের সুব্যবস্থা করে। লোকেরা ভুলে কুরআন করীমের আয়াতের অর্থ এভাবে করেছে। আদমকে এমন স্থানে রাখা হয়েছিলো যেখানে ক্ষুধা লাগে না, পিপাসা লাগে না। অথচ এ সর্বৈব ভুল। এতে আসলে বলা হয়েছে, ইসলামী সরকারের এটা অবশ্যকর্তব্য যেন এটা লোকদের জন্যে কাজের সংস্থান করে। কেউ কাজ করতে না পারলে তার খাবার সংস্থান করে। মোটকথা খাদ্য, পানি, বাসস্থান ও পরিধান এ চারিটি জিনিষ সরকারের দায়িত্বে। আর এ চারিটি বিষয়ই **ইন্না লাকা আল্লা তাজূ'আ ফীহা ওয়ালা তা'রা ওয়া আন্নাকা লা তাযমাউ ফীহা ওয়া লা তাযহা** অর্থাৎ নিশ্চয় এতে তোমার জন্যে (বিধি ব্যবস্থা) রয়েছে তুমি এতে ক্ষুর্ধাত থাকবে না এবং নগ্নও থাকবে না। আর তুমি এতে তৃষ্ণার্ত থাকবে না এবং রৌদ্রেও পুড়বে না (সূরা ত্বা হা: ১১৯-১২০)। এতে বর্ণনা করা হয়েছে। হে আদম! লোকেরা আপত্তি উত্থাপন করলে তুমি বলে দাও, সরকারের প্রথম কল্যাণপ্রদ কাজ হবে এই, তোমরা ক্ষুধার্ত থাকবে না। যেমন সরকারের এই কর্তব্য, কেউ জঙ্গলে পড়ে থাকলেও তার খাবারও যেন সংস্থান করা হয়। **ওয়ালা তা'রা** এবং তোমরা নগ্নও থাকবে না। কেননা, তোমাদের কাপড়ের জন্যেও সরকার জিম্মাদার হবে। এমনিভাবে **লা তাযমাউ** এতে বলা হয়েছে, সরকার তোমাদের পানির জন্যেও জিম্মাদার হবেন। আর **ওয়ালা তাযহা** এতে বলা হয়েছে, তোমাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। আর যে সরকারের দায়িত্ব এ চারটি বিষয় থাকে তা নেহায়েৎ উচ্চস্তরের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধানকারী সরকার হয়ে থাকে।

অতএব এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এটা বলেছেন, নি:সন্দেহে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপে কিছু কষ্ট থাকলেও তোমাদের কল্যাণ এতে নিহিত। ব্যবস্থাপনার খাতিরে কিছু বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করো। কেননা, এ ছাড়া ক্ষুৎপিপাসা পোষাক-আশাক ও বাসস্থান আর দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা অর্থাৎ

জান্নাতের ব্যবস্থা হতে পারে না। অতএব তোমাদের কল্যাণের খাতিরে এ প্রতিবন্ধকতা ।

যেহেতু আদমের সময় পর্যন্ত মানুষের মেধা-মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিকাশ লাভ করেনি এবং কেবল কোন কোনটি ছাড়া পাপেরও পূর্ণ ব্যাপ্তি লাভ হয় নি তাই তাদের জন্যে কোন কোন আদেশ-নিষেধ জারী করা হয়েছিলো। আর তা এ পর্যন্তই ছিলো যা ব্যবস্থাপনাভিত্তিক শাসনের জন্যে প্রয়োজন ছিল। তাই আদমের (আ:) ব্যাপারে কুরআন করীমে কোথাও উল্লেখ নেই, তিনি লোকদেরকে শরীয়তের মসলা-মাসায়েলই শিখাতেন। যেখানে উল্লেখ এসেছে এ চারটি বিষয়েরই উল্লেখ এসেছে।

অতএব হযরত আদম কেবল দুনিয়াকে সভ্য ও সংস্কৃতিবান বানিয়েছিলেন। কিন্তু এটা সেই সময়ের জন্যে একটি বিপ্লব ছিলো। আর প্রকৃতপক্ষেও একটি মহান বিপ্লব। দুনিয়ার সমকালীন সভ্যতা-সংস্কৃতি এরই ফসল।

দ্বিতীয় পর্যায়– হযরত নূহ (আ:)-এর আন্দোলন

এরপর দ্বিতীয় পর্যায় এলো। আস্তে আস্তে আদমের অনুসারীবৃন্দ যখন উন্নতি করলো এবং তারা দুনিয়াকে পথপ্রদর্শনের কাজ আরম্ভ করে দিলো তখন মানব-সভ্যতা উন্নতি করতে থাকলো। সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে মানুষের যে ভয়-ভীতির সম্পর্ক চলে আসছিলো তা বিলুপ্ত হতে থাকে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে সামগ্রিকভাবে জাতির কল্যাণার্থে পদক্ষেপ রাখা হোক– তারা একথায় অভ্যস্থ হয়ে গেলো। এর ফলে এগিয়ে চলার শক্তি সৃষ্টি হয়। কোন কোন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বেরিয়ে আসে। আর কোন কোন লোক স্বল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন বলে প্রমাণিত হয়। কেউ স্বীয় কাজকর্মে খুবই দক্ষ বলে প্রমাণিত হয় এবং কেউ হয় নিষ্কর্মা। কেউ নিজস্ব প্রতিভা বলে বহু আগে বেড়ে যায় এবং কেউ পিছে পড়ে থাকে। কেননা, বিভিন্ন মানুষের শক্তিসামর্থ্যে পার্থক্যতো হয়েই থাকে। কিন্তু এর অভিপ্রকাশ ঘটে থাকে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবনে। আর সভ্যতা ও সংস্কৃতি যতটা প্যাঁচালো ও সূক্ষ্ম হতে থাকে মানবীয় যোগ্যতাসমূহেও ততটা পার্থক্য সুস্পষ্ট হতে থাকে। দুটো ভিন্নধর্মী শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের সাধারণ সভ্যতা-সংস্কৃতির অঙ্গনে কাজে লাগানো গেলে পার্থক্য তো পরিস্ফুট হবে কিন্তু ততটা পরিস্ফুট হবে না যতটা হবে উন্নততর সভ্যতা-সংস্কৃতির মাধ্যমে কাজ করতে হলে। উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তো কখনো পার্থক্য এতটা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যে, এক উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষকে অন্য কোন শ্রেণী বলে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং আদমের শেষ পর্যায়ে এমনভাবেই পরিদৃষ্ট হতে লাগলো। আর

ফল এই দাঁড়ালো, যে-ব্যক্তি সাধারণ ছিলো সে কোন কোন ব্যক্তিকে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী মনে করে নিলো। আর যেহেতু মনোবিজ্ঞানের দর্শন তখনও প্রকাশিত হয়নি এবং জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সেই যুগের লোক এ ধারণা করতো, সব মানুষ একই প্রকারের হয়ে থাকে। আর তাদের মাঝে থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কেউ বেরিয়ে এলে অবশ্যই সে অন্য কোন অতি মানবীয় শক্তির অধিকারী।

পাপ কিভাবে উন্নতি করলো

এ জন্যে সেসব লোকের মাঝে প্রথম যে অনুভূতি জেগেছিলো তাহলো শিরকের বা অংশীবাদিতার। আর তারা তাদের মাঝ থেকে কোন কোন লোককে খোদাই শক্তিসমূহ দ্বারা গুণান্বিত বলে মনে করে নিয়েছে এবং এ রকম ধারণা করতে লেগে গেছে, অমুক ব্যক্তি যিনি এতটা যোগ্য, এতটা পরামর্শদাতা, এতটা সমঝদার এবং এতটা জ্ঞানী ছিলেন যে, তিনি মানুষই ছিলেন না বরং খোদা ছিলেন। খোদা যদি না হতেন তাহলে তার যোগ্যতা আমাদের চেয়ে বেশি হতো না। এভাবে শিরকের গোড়াপত্তন হলো। চিন্তা-শক্তি বিকাশের ফলে যখন একদিকে শিরকের ব্যাধিগুলো লোকদের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে গেলো আর অন্য দিকে মানুষের অন্তরে সেসব পাপ সৃষ্টি হতে থাকলো যা প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা-সংস্কৃতির অবশ্যম্ভাবী ফসল। সে সময় আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ (আ:)কে পাঠালেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বাণী– শরীয়ত বা বিধি-বিধানের অবতরণ

সুতরাং এটা ছিলো ঐশী সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্যায়। নূহ (আ:) থেকে এটা আরম্ভ হয়েছে। নূহ (আ:) সেসময় আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন লোকদের অন্তরে ঐশী গুণাবলীর অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো এবং ঐশী গুণাবলীর অনুভূতির পরই শরীয়তের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এ জন্যেই রসূলে করীম সল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত নূহ সম্বন্ধে বলেছেন, *আওওয়ালু নাবীয়্যিন শুরিআত আলা লিসানিহিশ্‌শারাইউ* অর্থাৎ নূহ সেই প্রথম নবী ছিলেন যার ওপর শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর সভ্যতা-সংস্কৃতির রংকে একটি স্থায়ী নিয়ম-কানুনের রং প্রদান করেন। কেননা, সে যুগে মানবীয় মস্তিষ্ক উন্নতি করে এরূপ উচ্চ মার্গে পৌঁছে গিয়েছিলো, যার জন্যে এ ধরনের পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং হাদীসে এসেছে, *আওওয়ালু নাবীয়্যিন শুরিআত আলা লিসানিহিশ্‌শারাইউ*। এর বিষয়বস্তু কুরআন শরীফেও পাওয়া যায়। **ইন্না আওহায়না ইলায়কা কামা আওহায়না ইলা নুহিন ওয়ান্নাবীঈনা মিম বা'দিহী** অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে ওহী করেছি যেভাবে নূহ এবং তার পরে নবীগণের কাছে ওহী

করেছি (সূরা নিসা: ১৬৪)। হে মুহাম্মদ! সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালাম আমরা তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ করেছি এ সেই রকম ওহীই যেরূপ ওহী নূহ এবং তার পর নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম। তাই প্রথমে ওহী ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে নূহের কাছে হয়েছিলো। আর সবচেয়ে আগে ঐশী-গুণাবলীর বিস্তারিত বিবরণের দরজা তাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিলো। কেননা, সে সময় পর্যন্ত মানবীয় মেধা-মস্তিষ্ক অনেক উন্নতি সাধন করেছিলো। আর মানুষের মস্তিষ্ক ঐশী গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা আরম্ভ করেছিলো এবং সেই চেষ্টায় ঘাত প্রতিঘাত খেয়ে খেয়ে শিরকের বিশ্বাস উদ্ভাবন করেছিলো। সুতরাং কুরআন করীমে শিরকের উল্লেখ নূহ-এর উল্লেখের সাথেই আরম্ভ হয়।

অতএব নূহ ছিলেন প্রথম শরীয়তধারী নবী। এই অর্থে যে তাঁর যুগে মানুষ আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ করতে লেগে গিয়েছিলো আর তাদের মস্তিষ্ক প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার উর্ধ্বের বিষয়বস্তুকেও বুঝার চেষ্টায় লেগে গিয়েছিলো।

তৃতীয় পর্যায়: ইব্রাহিমী আন্দোলন

এর পরে তৃতীয় পর্যায় হলো ইবরাহীম (আ:)-এর যুগের। যদিও নূহ (আ:)-এর ব্যাপারে কুরআন করীম থেকে জানা যায়, তাঁর যুগে শির্ক মাথাচারা দিয়েছিলো এবং তিনি কঠোরতার সাথে তা দমন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই যুগ পর্যায় ছিলো ঐশী গুণাবলী অনুভবের প্রাথমিক অবস্থা এবং শির্কও প্রাথমিক আকৃতিতে অবস্থান করছিলো। কোন কোন লোক সম্মানিত লোকদের প্রতিমূর্তি পূজো করতে লেগে গিয়েছিলো। অন্যান্য কোন কোন লোক আরও সাদা সিদা ধরনের শির্ক অবলম্বন করে নিয়েছিলো। কিন্তু ইব্রাহীম (আ:)-এর যুগে শির্ক একটি দার্শনিক বিষয় হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করে। আর তখন বুদ্ধির ওপর দর্শনের বিজয় আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। এর সাথে তৌহীদ ও একত্ববাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পথগুলোও বের হয়ে আসছিলো যেগুলোর ওপর আমল করা ছিল কেবল তৌহীদের মোটা মোটা বিষয়গুলোর ওপর আমল করার শামিল। আর এ ছিলো খুবই কষ্টসাধ্য । এর দৃষ্টান্ত এমনই যেভাবে মূর্তি পূজা আজও পৃথিবীতে মজুদ আছে। কিন্তু আজ যদি মূর্তি পূজকদের বলা হয়, তোমরা কেন মূর্তি পূজা কর? তারা বলে, আমরা তো কোন মূর্তি পূজা করি না। আমরা তো কেবল নিজেদের ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করার জন্যে একটি মূর্তিকে সামনে রেখে নিই, যদিও শির্ক তো তা-ই যা পূর্বে ছিলো। কিন্তু এখন শির্ককে একটি নতুন রূপ দেয়া হয়েছে। এভাবেই ইব্রাহীম (আ:)-এর যুগে শির্ককে নতুন রূপ দেয়া হয়েছিলো। এ কারণেই ইব্রাহীম (আ:)-এর ব্যাপারে বারে বারে বলা হয়েছে, **ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন** অর্থাৎ, আর আমি মুশরিক ও অংশীবাদীদের

অন্তর্ভুক্ত নই। আর নূহ (আ:)-এর ব্যাপারে এটা একবারও বলা হয়নি। কেননা, নূহ (আ:)-এর যুগ পরিপূর্ণ শির্কের যুগ ছিলো না। লোকেরা কেবল নিম্নস্তরের শির্কে লিপ্ত ছিলো। এথেকে রক্ষা করার জন্যে অধিক জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন ছিলো না। আর মূর্তির সামনে ঝুঁকা এবং না ঝুঁকার বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝতে পারতো। কিন্তু ইব্রাহীমের (আ:) সময়ে শির্ক বাহ্যিক স্তর অতিক্রম করে অভ্যন্তরীণ রুসূম-রেওয়াজ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। আর মূর্তির সামনে না ঝুঁকার দার্শনিক তত্ত্বের উন্নতির ও চিন্তাশক্তির উন্নতির বুদ্ধিভিত্তিক অংশীবাদিতার আর এক ধরন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এর মূলোৎপাটন করেন হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস সালাম।

ইব্রাহীমি আন্দোলনের বাণী

অতএব এরূপ যুগে, যা ছিল পরিপূর্ণ তৌহীদপন্থীর যুগ, যেহেতু তিনিই– **মা কানা মিনাল মুশরিকীন** বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন এজন্যে হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস সালামের ব্যাপারে এ কথা ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত নূহ আলায়হেস সালামের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়নি। নচেৎ এ উদ্দেশ্য নয় যে নূহ (আ:) উচ্চ স্তরের তৌহীদপন্থী ছিলেন না । সুতরাং দেখে নাও হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস সালাম সম্বন্ধে কুরআন করীমে পাঁচ বার উল্লেখ এসেছে। আর পাঁচটি স্থলে– **ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন** বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নূহ (আ:)-এর প্রসঙ্গে এ কথা আসে নি। এতে বুঝা যায়, তাঁর যুগে নূহ (আ:) যেন শিরকের সাথে মোকাবেলা করেছেন। কিন্তু যেহেতু সে সময়ে পরিপূর্ণ শিরকের সাধারণভাবে বিকাশ ঘটেনি এজন্যে **ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন** নামে তাঁকে ডাকার প্রয়োজন হয়নি। কেননা, মূর্তিপূজার বোঝা থেকে দূরে সরে থাকা সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিই অবহিত ছিলো যে, তিনি অংশীবাদী নন। এর দৃষ্টান্ত এমনই যেভাবে সুই দিয়ে সব মেয়ে লোকই কাজ করতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক মেয়েলোককে দরজী বলা যায় না। কেননা, দরজীর জন্যে নিজ কৌশলে পারদর্শী হওয়া জরুরী। এভাবেই নূহ (আ:)-এর প্রসঙ্গে আমরা বলে থাকি, তিনি শির্কের সাথে মোকাবেলা করেছেন। কিন্তু ইব্রাহীম (আ:)-এর প্রসঙ্গে আমরা বলে থাকি, শির্কের মোকাবেলা তাঁর পেশা ও কৌশলে রূপান্তরিত হয়েছিলো। এজন্যে তাঁর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে **ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন**। মোটকথা ইব্রাহীম (আ:)-এর যুগে বাহ্যিক শিরক বাদেও অন্য আর একটি মেধাভিত্তিক শির্ক ও দর্শন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এ সময়ে কেবল এ শির্কই ছিলো না যে কোন কোন লোক মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাতো বরং ভালবাসা ও ঘৃণার সূক্ষ্ম পন্থাসমূহের ওপর চিন্তা করে মানবীয় অনুভূতিসমূহ বহু

উন্নতি করে গিয়েছিলো। আর তখন বাহ্যিক শির্ক করা ছাড়াও মানুষ বুদ্ধিগতভাবে মুশরিক হতে পারতো। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা নূহ (আ:)কে এটা বলেন নি **আসলিম** আত্মসমর্পণ কর। আর এর উত্তরে তিনি বলতেন, **আসলামতু লি রব্বিল আলামীন** অর্থাৎ আমি সারা জগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। বরং ইবরাহীম (আ:)কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছিলেন, **আসলিম** অর্থাৎ আমি তোমাকে কেবল এটাই বলি না, মূর্তি পুজা করো না বরং তোমাকে এ-ও বলছি তুমি নিজের অন্তরের ধ্যান ধারণাসমূহকেও সার্বিকভাবে আমার আনুগত্যে সমর্পণ কর। ইব্রাহীম (আ:) উত্তর দিয়েছিলেন, **আসলামতু লি রব্বিল আলামীন** (সূরা বাকারা: ১৩২)। অর্থাৎ হে খোদা! আমার দেহের অণু-পরমাণু তোমার সমীপে উৎসর্গীত। আমার বুদ্ধি, আমার জ্ঞান আমার মস্তিষ্ক সব কিছুই তোমার হুকুমের দাস। আর আমার সব রকম শক্তি ও সব রকম সামর্থ্য তোমার রাস্তায় নিয়োজিত। এজন্যেই তাঁর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে **ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন**। এটাও সেই তৌহীদ ও একত্ববাদ যাতে আস্থা স্থাপন করাকে তৌহীদ বলে। আর প্রকৃতপক্ষে তৌহীদ তা-ই হয়ে থাকে যা আস্থাশীল হয়। মানুষ যখন এটা বলতে থাকে, আমার সব কাজ শেষ। এখন আমার খাওয়া, পান করা, আমার উঠা-বসা, আমার ঘুমান, আমার জাগরিত হওয়া, আমার মৃত্যু বরণ করা, আমার বাঁচা সবই খোদার উদ্দেশ্যে। সুতরাং দেখে নাও এর পার্থক্য পরে কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নূহ (আ:)-এর প্লাবনের সময়ে যখন বাঁচার প্রয়োজন দেখা দিলো তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে বল্লেন, তুমি একখানা নৌকা তৈরী কর। এতে চড়ে তুমি ও তোমার সঙ্গীরা প্লাবন থেকে রক্ষা পাবে। খোদা তাঁকে নৌকা বানিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন ইব্রাহীম (আ:)কে খোদা বল্লেন, যাও তোমার পুত্র ইসমাঈল (আ:)কে বৃক্ষ-লতাহীন উপত্যকায় ছেড়ে আস। তখন তিনি তাকে এমন কোন নির্দেশ দেননি যে, তার খাওয়া ও পান করার জন্যে তাকে ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি তাকে মাত্র এ আদেশ প্রদান করলেন, যাও তোমার স্ত্রী ও তোমার ছেলেকে অমুক উপত্যকায় ছেড়ে আস। তাই তিনি গেলেন এবং হাজেরা ও ইসমাঈলকে পানিশূন্য বিরান ভূমিতে ছেড়ে চলে এলেন। তাঁর এ দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো, যে খোদা তাদের ঘরে রিয্ক দিচ্ছিলেন তিনিই তাদের এখানেও রিযক সরবরাহ করবেন। মোটকথা ইব্রাহীম (আ:) নূহ (আ:)-এর তুলনায় তওয়াক্কাল ও খোদার প্রতি আস্থার দিক থেকে উন্নততর মার্গে অবস্থিত ছিলেন। পরিপূর্ণ আস্থার মার্গই পরিপূর্ণ তৌহীদের মান হয়ে থাকে। এটা ইব্রাহীম (আ:)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ইব্‌রাহীম (আ:)-এর মাধ্যমে মানবতার পরিপূর্ণতা

এভাবে মানবতার পরিপূর্ণতাও ইব্‌রাহীম (আ:)-এর মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবতার পরিপূর্ণতা ও তৌহীদের পরিপূর্ণতা এক ও অভিন্ন। যতক্ষণ তৌহীদে পরিপূর্ণতা না আসে ততক্ষণ মানবতা পরিপূর্ণ হতে পারে না। এজন্যে সুফীগণ বলেছেন, *মান আরাফা নাফসাহূ ফাকাদ 'আরাফা রব্বাহূ* অর্থাৎ যে-ব্যক্তি নিজেকে নিজে চিনে নিয়েছে সে খোদাকেও চিনেছে। অতএব যেভাবে মানবীয় জ্ঞানের বিবর্তন ইব্‌রাহীম (আ:)-এর মাধ্যমে হয়েছে অর্থাৎ মানুষকে অন্যান্য জিনিষ থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নরবলী রহিত করে দেয়া হয়েছে। তাঁর (আ:) পূর্বে মানুষের জীবনের কোন মূল্যই দেয়া হতো না। যে মরে গেছে, মরে গেছে। যে জীবিত আছে, জীবিত রয়েছে। কিন্তু ইব্‌রাহীম (আ:)-এর যুগে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মাঝে পার্থক্য করা হলো। তখন পর্যন্তও মানুষ ও জানোয়ারের মাঝে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপিত হয়নি। ধারণা করা হতো, উভয়েই খায় ও পান করে। উভয়েই সন্তান উৎপাদন করে। উভয়েই চলাফেরা করে। পার্থক্য কেবল এই, মানুষের মস্তিষ্কের উন্নতি সুস্পষ্ট। এ কারণেই সেই সময় পর্যন্ত কুরবানীর জন্যে মানুষকে কখনো কখনো পেশ করে দেয়া হতো। কেননা, মানুষ ও জন্তুর মাঝে এমন কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য মনে করা হতো না। কেবল এ অনুভূতি ছিলো, মানুষ অধিক মূল্যবান এবং জন্তু-জানোয়ার কম মূল্যবান। কিন্তু যখন ইবরাহীম (আ:)-এর যুগে মানুষ একত্ববাদ ও তৌহীদকে বুঝে নিলো তখন খোদা বল্লেন, এখন তার কুরবানী হতে পারে না। কেননা, তখন সে আর জন্তু-জানোয়ার নয়। আর জীবনে তার সত্তার একটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তাই সেই মার্গে মানুষের পৌঁছার কারণে ইব্‌রাহীম (আ:)কে নবীদের পিতা বলা হয়েছে যেভাবে আদম (আ:)কে মানুষের পিতা বলা হয়েছে।

মোটকথা হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর যুগে পুনরুত্থানের সঠিক মাহাত্ম্য মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। আর এতে বলা হয়েছে, মানব-জীবন ঐশী নৈকট্য লাভ করার মাধ্যম। এজন্যে কেবল এ বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও তার কুরবানী ছাড়া গত্যন্তর নেই। তার অনর্থক কুরবানী স্বয়ং সেই উদ্দেশ্য বিনাশ করে,যার জন্যে মানব সৃষ্টি করা হয়েছে। যেন এখন কুরবানীর দর্শন বুদ্ধিভিত্তিক হয়ে গেছে বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক নয়। যেমন, যুদ্ধে মানুষ বলি দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, যাও এবং মৃত্যুবরণ করো। আর সেই উপলক্ষ্যে যেমন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, নরবলী সিদ্ধ নয় তখন সাথে সাথে এ জবাবও মিলে যাবে, নগণ্যকে উচ্চ শ্রেণীর জন্যে উৎসর্গ করে দেয়া হয়। উচ্চ শ্রেণী নগণ্যের জন্যে

কুরবানী হয় না। মোটকথা কুরবানীর দর্শনও বুদ্ধির অধীনে এসে যাবে এবং কোন কোন অবস্থায় এ কুরবানী পেশ করা বৈধ বরং প্রয়োজনীয় হবে এবং কোন কোন অবস্থায় বৈধ নয়। আর এর সাথেই এ ধারণা যখন সৃষ্টি হয়ে গেলো মানুষ সব সৃষ্টির সেরা তখন এ ধারণা থেকে তাসাওউফ (সুফীবাদ)-এর যুগ আরম্ভ হয়ে গেলো এবং মানুষ এটা মনে করতে লাগলো, আমি এজন্যে সৃষ্টি হয়েছি যেন নিজ খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করি এবং তাঁর প্রিয় হই। অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ:) থেকে সুফীবাদের জন্ম হলো। সুতরাং এ সময়ে কেবল ভিত্তি রচিত হয়েছিলো এবং উন্নতি পরে হয়। আর এথেকে এ মনোযোগ সৃষ্টি হয়, সিদ্ধান্ত যখন নেয়া হলো যে, মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে না এবং এর ভিত্তি এ বিষয়ের ওপর রাখা হলো, এজন্যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে যেন সে খোদার ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়। তখন প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি এ চিন্তায় নিয়োজিত হলো কিভাবে সে খোদার প্রেমিকের মর্যাদা লাভ করার জন্যে চেষ্টা করে। আর এভাবে সুফীবাদের ভিত্তি রচিত হয়।

পরিপূর্ণ সভ্যতার ভিত্তি ইব্রাহীম (আ:) কর্তৃক রচিত হয়

নরবলি যখনই রহিত করা হলো তখন তা মানুষের মনকে এদিকেও ধাবিত করে দিলো, যেন দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তু মানুষের সেবার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ ধারণা যখন সৃষ্টি হলো তখন সাথে সাথে ঐশী বিধানের প্রতি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর চিন্তাও আরম্ভ হয়ে গেলো এবং সভ্যতার চরম মার্গের প্রতি মানুষের দৃষ্টি ধাবিত হলো। অতএব মানব সভ্যতার চূড়ান্ত মার্গের পর্যায়ও সত্যিকার অর্থে ইব্রাহীমের (আ:) যুগ থেকে আরম্ভ হয়। আসল কথা এই, এ যুগের পূর্বে মানুষ কেবল একজন প্রেমিকের আকারে ছিলো। তার মস্তিষ্কে প্রেমাস্পদ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি করা যেত না। কেননা, তার অসম্পূর্ণ উন্নতিকে দেখে ভয় করা হচ্ছিলো সে না আবার অলস ও অমনযোগী হয়ে যায়। কেননা, তখনও তার মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম দর্শন সহ্য করার যোগ্য ছিলো না। কিন্তু ইব্রাহীম (আ:)-এর সময়ে সে এর যোগ্য হয়ে গিয়েছিলো। তার ওপর এ রহস্য উন্মোচিত করা হয়। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ:) মানুষের ঐশী প্রেমাস্পদ হওয়ার দর্শন পেশ করেন। আর যেহেতু প্রেমিক প্রেমাস্পদের প্রাণের বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া পছন্দ করে না এজন্যে তার কুরবানী রহিত করা হলো। সুতরাং এটা ছিলো সুফীবাদের প্রাথমিক পর্যায়।

এভাবে ইবরাহীম (আ:)-এর জীবন-দর্শনের যুগ ছিলো মানুষের বোধির যুগ। কেননা, সে সময়ে মানুষের সামনে এ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হলো, এ জীবন অর্থহীন ও অযথা নয় বরং নিজ সত্তায় এক মহান আশিস এবং ভবিষ্যত উন্নতিসমূহের জন্যে সম্পদ জমা করার মাধ্যম।

মূসায়ী যুগ ও এর বাণী

এরপর মূসায়ী যুগ আরম্ভ হলো। এ যুগ একটি নতুন পরিবর্তন ও নতুন বিপ্লব নিয়ে এলো। অর্থাৎ এখন ধর্ম ও পার্থিব বিষয়াদি মিলিয়ে দেয়া হলো এবং কুফরী ও ইসলামের মাঝে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়া হলো। আদমের যুগে কথা সভ্যতা-সংস্কৃতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। নূহ (আ:)-এর যুগে শির্ক ও একত্ববাদের মাঝে প্রাথমিক পাথর্ক্য সৃষ্টি হলো এবং একটি সীমাবদ্ধ শরীয়তের ভিত্তি রচিত হলো। ইব্রাহীম (আ:)-এর যুগে একত্ববাদকে চূড়ান্ত রূপ দেয়া হলো। কিন্তু মূসায়ী যুগে মানুষের মস্তিষ্ক এমন একটি সীমা পর্যন্ত উন্নতি সাধন করছিলো, তখন প্রয়োজন ছিলো যেন ধর্মীয় ও পার্থিব নিয়ম কানুনের ওপর বিধৃত একটি হেদায়াতনামা অবতীর্ণ হয়। যেন একটি সময়ে ধর্ম ধর্মীয় ও পার্থিব উভয়ের দায়িত্ব বুঝে নেয়। আবার এ যুগে কুফরী ও ইসলামের পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিলো। মূসা (আ:)-এর পূর্বে কুফরী ও ইসলামে পার্থক্য সৃষ্টি হয় নি। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ:) কাফিরদের কন্যাকে নিয়ে নিতেন এবং তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতেন। কিন্তু মূসায়ী যুগে সত্য ধর্ম আলাদা ধরন ও বিশিষ্ট আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছিলো। যেভাবে আদম ও নূহ (আ:)-এর যুগে মানুষ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলো। তখন বিস্তারিত বিধানের প্রয়োজন ছিলো। এর সম্পর্ক সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও আধ্যাত্মিক এ তিনটি বিষয়ের সাথে সৃষ্টি হয়। এতে সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় বিধি-বিধানও থাকুক, যেমন এভাবে ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো, আপোষে সম্পর্ক সৃষ্টিতে অমুক বিষয় সমুন্নত রাখো। আর এতে রাষ্ট্রনৈতিক পথ-নির্দেশনাও থাকুক যেন রাজাবাদশাহ্রা এভাবে কাজ করে এবং রাজার সাথে প্রজাদের এমন আচরণ হয়। পুনরায় এতে আধ্যাত্মিক বিধি-বিধানও যেন থাকে, যেমন ইবাদত কিভাবে করতে হয়। আর আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য কিভাবে লাভ করা যায়।

অর্থাৎ তখন এমন একজন নবীর প্রয়োজন ছিলো যিনি একই সময়ে নবীও হন; বাদশাহ্ও হন এবং সেনাপতিও হন। আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আ:)-কে এ কাজের জন্যে মনোনীত করলেন। আর যেহেতু মানবীয়বুদ্ধি অনেক উন্নতি লাভ

করেছিলো, একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ব্যাপ্তি লাভ করেছিলো, দর্শন স্বীয় চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছে যাচ্ছিলো, এ সময়ে তাই এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন ছিলো যিনি আদমও হন, নূহও হন এবং ইব্রাহীমও হন। অতএব হযরত মূসা (আ:) এ তিনটি মর্যাদায় আবির্ভূত হলেন। আর তাঁর মাধ্যমে বিস্তারিত বিধি-বিধান দুনিয়াকে প্রদান করা হলো। এর সম্পর্ক রাষ্ট্রনীতি, আধ্যাত্মিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি এ তিনটির সাথেই ছিলো। এতে রাষ্ট্রনৈতিক পথ-নির্দেশনাও ছিলো। আধ্যাত্মিক এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়কও ছিলো। এভাবে তাঁর মাধ্যমে যে বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিলো তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে বিধৃত ছিলো:

মূসায়ী যুগের প্রথম বিপ্লব– পূর্ণ শরীয়ত

একটি পুর্ণ শরীয়ত বা বিধান হলো তা যাতে ইবাদত, আধ্যত্মিকতা, রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তারিত বিবরণ বিধৃত থাকে। এর উদাহরণ ইতোপূর্বে কোন নবীর মাঝে পাওয়া যেত না। এর মাধ্যমে দেহ ও আত্মার গভীর সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়েছিলো। আর আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গসমূহ লাভ করার পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিলো। ইব্রাহীম (আ:)-এর যুগে কেবল দেহের সৌন্দর্য ও পরিপোষণ স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু দেহ ও আত্মার গভীর সম্পর্ক সম্বন্ধে কেবল মূসা (আ:)-এর সময়ে উন্মোচিত হয়েছিলো। এভাবে আধ্যাত্মিক মার্গসমূহ লাভ করার অর্গলসমূহ মানব সন্তানদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে বলেন, **সুম্মা আতায়না মূসালকিতাবা তামামান 'আলাল্লাযী আহসানা ওয়া তাফসীলাল্লিকুল্লি শায়ইঁ ওয়া হুদাঁ ওয়া রহমাতান লা'আল্লাহুম বিলিকাই রব্বিহিম ইউ'মিনূন** (সূরা আনআম: ১৫৫)।

অর্থাৎ পুনরায় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি সেই ব্যক্তির প্রতি মহাঅনুগ্রহ করার জন্যে যে আমাদের পুরোপুরি আনুগত্য করেছিলো। সেই কিতাব সব রকম বিধি-বিধান সম্বলিত ছিলো। আর এতে পথ-নির্দেশনা ও করুণার কথা-বার্তা ছিলো। **লা'আল্লাহুম বিলিকাই রব্বিহিম ইউ'মিনূন**– যেন লোকেরা আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে ঈমান আনে।

পুনরায় আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **ওয়া কাতাবনা লাহূফিল আলওয়াহি মিন কুল্লি শায়ইম্মাও 'ইযাতাঁওয়া তাফসীলাল্লিকুল্লি শায়ইন** (সূরা আরাফ: ১৪৬) অর্থাৎ আমরা মূসার জন্যে কয়েকটি ফলকের ওপর যা কিছু লিখেছি এতে সব রকম উপদেশ ছিলো এবং এতে প্রত্যেক ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশাবলী বর্ণিত ছিলো। সুতরাং তওরাত সেই প্রথম ঐশী কিতাব যাতে মানব-সন্তানের জন্যে বিস্তারিত পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছিলো। আর মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে

এতটা উচ্চ মনে হয়েছিলো, তখন তার কাছে এ প্রত্যাশা করা হচ্ছিলো, সে অন্যদের মঙ্গলের খাতিরে নিজের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র স্বাধীনতাও উৎসর্গ করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। মানবীয় কর্মকান্ডের প্রত্যেকটি শাখার ওপর পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেমন, মহিলারা ঋতুবতী হলে এর জন্যে এ পথ-নির্দেশনা। মানুষ নাপাক অবস্থায় হলে এর জন্যে এ পথ-নির্দেশনা। অসুস্থ হলে এর জন্যে এ পথ-নির্দেশনা। উপাসনালয়ের জন্যে এ পথ-নির্দেশনা। মোটকথা **তফসীলাল্লিকুল্লি শায়ইন** অনুযায়ী মূসা (আ:)-এর মাধ্যমে প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাপারে বিস্তারিত পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়।

দ্বিতীয় বিপ্লব– ঐশী গুণাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা

দ্বিতীয় বিপ্লব হযরত মূসা আলায়হেস সালামের মাধ্যমে সাধিত হয়েছিল। তা ছিলো এই, যেন ঐশী গুণাবলী বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আ:)-এর যুগে যেহেতু মানবীয় বোধ উন্নতি করেছিলো এবং কোন কোন ঐশীগুণের সূক্ষ্ম বিষয়াবলী প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু ঐশী গুণাবলীর সূক্ষ্ম পারস্পরিক সম্পর্কাবলী ও ঐশী গুণাবলীর ব্যাপক সীমা পরিসীমা সেই সময় পর্যন্ত দুনিয়া উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে নি। আর এর সামনে তা উপস্থাপন করাও হয়নি। হযরত মূসা (আ:)-এর যুগে বিশ্ব এর যোগ্যতা অর্জন করলো। যেমন হযরত মূসা (আ:)-এর ওপর ঐশীগুণাবলী ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হলো। এর কারণে লোকদের মাঝে বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে উপলব্ধি করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিলো। যেন গুণাবলীর সার্বিক জ্ঞান বিস্তারিত আকারে পরিবর্তিত করে বান্দা ও খোদার মাঝে এবং বান্দা ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী একটি উন্নততর আকৃতি বের হয়ে এলো। হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর যুগে কেবল আল্লাহ্ তাআলার একত্ব পর্যন্ত মানব-মস্তিষ্ক উন্নতি করেছিলো। ঐশীগুণাবলী যে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মত পৃথক পৃথক আছে সে তা উপলব্ধি করতে পারে ততটা উন্নতি করেনি। এর দৃষ্টান্ত এমনই যেভাবে আমরা পূর্বে বলেছি, একজন বাদশাহ্ রয়েছেন যার আনুগত্য করা আবশ্যক। আবার অন্য সময়ে আমরা বলি সেই বাদশাহ্র অধীনে কোন কোন কর্মকর্তা আছেন তাদের সবার আনুগত্য করাও আবশ্যক। আর তাদের আনুগত্যও বাদশাহ্র আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। পুনরায় আমরা এটা বলি, ইনি অমুক বিভাগের কর্মকর্তা এবং তিনি অমুক বিভাগের কর্মকর্তা। এ বিভাগ শিক্ষার সাথে সম্পর্ক রাখে। এটি তরবিয়তের সাথে সম্পর্ক রাখে। এভাবে আল্লাহ্ তাআলারও বিভিন্ন গুণ রয়েছে। আর সেসব গুণের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। যেগুলো পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার পর মানুষের মাঝে সত্যিকারের দোয়ার আবেগ সৃষ্টি হয়।

অতএব হযরত মূসা আলায়েহস সালামের যুগে লোকদের কাছে এ দরজা খুলে দেয়া হলো। ঐশী গুণাবলীর ব্যাপারে তাদের ব্যাপক জ্ঞান দান করা হলো। সুতরাং যারা হযরত মূসা (আ:)-এর কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন তারা উপলব্ধি করতে পারেন, মূসা (আ:)-এর মাধ্যমে যত ঐশীগুণাবলী বর্ণিত হয়েছে কাছাকাছি এতটা গুণাবলীই কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। আমি একবার চিন্তা করলাম তখন আমার কমপক্ষে সে সময়ে এমন কোন নূতন গুণ দৃষ্টিতে পড়েনি যা কুরআন বর্ণনা করেছে অথচ তওরাত বর্ণনা করে নি। সেই রব, রহমান, রহীম ও মালিকি ইয়াওমিদ্দীন প্রভৃতি গুণাবলী যা ইসলাম বর্ণনা করেছে তা-ই হযরত মূসা (আ:) বর্ণনা করেছিলেন। মোটকথা মূসায়ী যুগে মানুষের মস্তিষ্ক এতটা যোগ্যতা অর্জন করেছিলো যে, সব ঐশীগুণে যে উচ্চ স্তরের বিভাগ রয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারে। যেন ঐশীগুণাবলীর সার্বিক জ্ঞান বিস্তারিত আকারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর বান্দা ও খোদার এবং বান্দা ও বান্দার মাঝে সম্পর্কের উন্নততর আকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ এটাই, মূসা (আ:) সেই প্রথম নবী যার পরে নবীদের এক দীর্ঘ ধারা এমন এসেছে যারা সার্বিকভাবে তাঁর শরীয়তের অনুবর্তী ছিলো। তাঁদের যদিও সরাসরিভাবে নবুওয়ত লাভ হয়েছিলো, তাই মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর বিভাগগুলো সম্বন্ধে বুঝতে চেষ্টা করলো তখন আল্লাহ্ তাআলা বল্লেন, এখন তোমরাও তোমাদের বিভাগ তৈরী করে নাও যেন এখন থেকে তোমাদের মাধ্যমে একটি বাহ্যিক শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। আর খলীফাগণ আসবেন, তারা শাসন করবেন। অতএব হযরত মূসা (আ:) প্রথম নবী ছিলেন যাঁর পরে প্রত্যাদিষ্ট খলীফাগণ এসেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে নবীদের এক দীর্ঘ ধারা অব্যাহত থাকে। তাঁরা সরাসরিভাবে নবুওয়ত লাভ করতেন অথচ তাঁরা মূসা (আ:)-এর শরীয়তের অধীন ছিলেন।

সেই সময় ধর্ম রীতিমত একটি দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করে। এটা মানবীয় জীবনের সব দিকে আলোকপাত করেছিলো, যেন শরীয়তের অট্টালিকায় পরিণত হয়ে চারিদিক থেকে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এটাই দর্শনের চূড়ান্ত মার্গ ছিলো। ইব্রাহীম (আ:) যখন ঐশীগুণাবলীর দোর গোড়ায় এলেন তখন বললেন, **রব্বি আরিনী কায়ফা তুহ্ইল মাওতা** (সূরা বাকারা: ২৬১) অর্থাৎ হে আমার প্রভু, মৃতকে জীবিত করার গুণের প্রকাশ আমাকে দেখাও। কিন্তু যেহেতু মূসা (আ:) ইব্রাহীম (আ:)-এর চেয়ে ঐশীগুণাবলী সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান রাখতেন তাই তিনি বল্লেন, **রব্বী আরিনী আনযুর ইলায়কা** (সূরা আ'রাফ: ১৪৪)। অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক, তোমার সব রকম গুণের জ্ঞান আমার লাভ হয়েছে এখন আমার আকাঙ্ক্ষা এই, তুমি তোমার গোটা সত্তা আমাকে দেখিয়ে দাও। যেন একজন কেবল একটি গুণের বিকাশ দেখতে চেয়েছেন কিন্তু অন্যজন স্বয়ং

খোদাকেই দর্শন করতে চেয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ:) বলেন, **রব্বী আরিনী কাযফা তুহ্ইল মাওতা** আর হযরত মূসা (আ:) বলেন, **রব্বী আরিনী আনযূর ইলায়কা**। একজন বলেন, আমাকে জীবিত করার গুণের দৃষ্টান্ত দেখাও। অপরজন বললেন, আমাকে তোমার সবকিছু দেখাও।

দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম এই, কোন নবী যখন আবির্ভূত হন তখন লোকেরা তো তাকে ছোট মনে করে কিন্তু তাঁর পূর্বের নবীকে বড় মনে করে থাকে। পরে যখন আগমনকারী নবীর পরিচয় বর্ণনা করা হয় তখন বলে, আগেরজন কি মূর্খ ছিলো? তাঁর এসব কথা কি জানা ছিলো না? এর এই কারণই, মূসা (আ:) যখন বল্লেন, আমি খোদা তাআলাকে দর্শন করেছি তখন ইহুদীরা, যারা হযরত ইব্রাহীমেরই সন্তান, রাগান্বিত হলো। এই মনে করে, তাদের তো এ উদ্দেশ্য, আমাদের দাদা কম জ্ঞানী ছিলেন আর তুমি তাথেকে অধিক তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী? এজন্যে তারা হযরত মূসা (আ:)কে বললো, তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদেরও খোদাকে (প্রত্যক্ষভাবে) দেখিয়ে দাও। সুতরাং কুরআন করীমে এসেছে, মূসা (আ:)-এর জাতি বললো, **ইয়্যা মূসা লান নু'মিনা লাকা হাত্তা নারাল্লাহা জাহরাতান** অর্থাৎ হে মূসা, আমরা তোমার এ কথা মানবার জন্যে প্রস্তুত নই যতক্ষণ আমরা স্বয়ং খোদাকে প্রত্যক্ষ না করি (সূরা বাকারা: ৫৬)। এখানে **'নু'মিনা'**-এর অর্থ ঈমান আনয়ন করা নয়। তারা তো আগেই হযরত মূসা (আ:)-এর ওপর প্রকাশ্যভাবে ঈমান রাখতো। **লান নু'মিনা**-এর অর্থ এই, তুমি যে আমাদের বলছো, আমি খোদাকে দেখেছি– এতে তুমি মিথ্যেবাদী। আর আমরা তোমার এ কথা অবশ্যই মানার জন্যে প্রস্তুত নই। তবে আমাদেরও যদি দেখিয়ে দাও তাহলে পরে বেশ আমরাও মেনে নেব।

এটাই ছিলো সেই আধ্যাত্মিক বিপ্লব, যা সব দিক থেকে পূর্ণ ছিলো। মূসা (আ:)-এর এ বৈশিষ্ট্য ছিলো। এর কারণে বলা হয়েছে, এই আধ্যাত্মিক বিপ্লবের শেষ আন্দোলনও মূসা (আ:)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে সাধিত হবে। যেমন বলা হয়েছে, 'তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ্য এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে' (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৬) এবং শেষ ধর্মগ্রন্থে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, **ইন্না আরসালনা ইলায়কুম রসূলান শাহিদান আলায়কুম কামা আরসালনা ইলা ফিরআওনা রসূলা'** (সূরা মুয্যাম্মিল: ১৬)। অর্থাৎ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত নিয়ে এসছেন যদিও প্রত্যেক দিক থেকে পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে কিন্তু বাহ্যিকভাবে পূর্ণতার দিক থেকে মূসা (আ:)-এর শরীয়তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ– অন্যদের সাথে নয়। অন্যদের

কিতাবের দৃষ্টান্ত এমন যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ। আর মূসা (আ:)-এর শরীয়তের দৃষ্টান্ত এমন যেভাবে একটি অট্টালিকা। এতে বিভিন্ন প্রয়োজনের খাতিরে বিভিন্ন কক্ষ রয়েছে। এর সব রকম প্রয়োজনের ব্যবস্থা এতে পূর্ণভাবে মজুদ আছে। আর কুরআন করীমে যদিও তাজমহলের ন্যায় সব অট্টালিকার সাথে সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারে, আলাদা আলাদা করে নির্মিত কক্ষগুলোর সাথে নয়। অতএব মূসা (আ:) সেই প্রথম নবী ছিলেন যাঁর মাধ্যমে সেই পূর্ণ বিধান পাওয়া গেলো যা সব ব্যবস্থাপনার ওপর বিস্তৃত ছিলো। যদিও উন্নত বিন্যাসের দিক থেকে এতেও কম্‌তি ও দুর্বলতা ছিলো।

তৃতীয় বিপ্লব-প্রত্যক্ষ ঐশী-বাণী লাভ

মূসা (আ:)-এর মাধ্যমে তৃতীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। মূসা (আ:)-এর যুগ পর্যন্ত ঐশী-বাণীর পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়ে চলে আসছিলো এবং এখন তা প্রত্যক্ষভাবে ওহী ও ঐশী-বাণীর পদ্ধতির আকারে প্রচলিত হলো। কেননা, শরীয়তের খুঁটি-নাটির ব্যাপারে বিতর্ক হওয়ার ছিলো। আর এর জন্যে শাব্দিক ওহীর প্রয়োজন ছিলো যেন খোদার কথা সংরক্ষিত হয়। এ কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন- **কালামাল্লাহু মূসা তাকলিমা** (সূরা নিসা: ১৬৫) অর্থাৎ মূসার কাছে বহু প্রত্যক্ষ ওহী হচ্ছিলো। এর অর্থ এই নয়, প্রথম থেকে প্রত্যক্ষ ওহী হতো না; বরং এর অর্থ এই, ইতোপূর্বে অধিক পরিমাণে স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের মাঝে ব্যাপ্ত ছিলো এবং এরই মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় নবীগণের কাছে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করে থাকতেন। কিন্তু মূসা (আ:)-এর শরীয়তের অধিকাংশ কথা প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছিলো। আর অধিক পরিমাণ স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের স্থান অধিক পরিমাণ শাব্দিক কথোপকথন দখল করে নিলো। কিন্তু তখনও অর্থ সংরক্ষণ করাকে প্রাধান্য দেয়া হয় নি। যেভাবে আমরা যায়েদের সাথে যখন কথা বলি তখন ভাষা ব্যবহার করি। এভাবে আমাদের কথা বুঝা তার কাছে সহজসাধ্য হতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের কথাগুলো তাকে মুখস্থ করাই না বরং তা তার মনে যেভাবে গেঁথে যায় তদনুযায়ী সে কাজ করে। কিন্তু আমরা আমাদের কথাগুলো সম্বন্ধে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে চাইলে আমরা তা লিখিয়ে দিই। আর এ পার্থক্যই কুরআনী ওহী ও মূসাই ওহীর মাঝে বিদ্যমান। যে কথাই শুনো তা-ই লিখো। মূসা (আ:)-এর যুগে এ আদেশ বলবৎ ছিলো না। যে কথা বলা হতো তদনুযায়ী বিষয়-বস্তুর ভিত্তিতে কিতাবে লেখা হতো। কিন্তু কুরআনী ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে এর যবর, যের, পেশ এবং জযম পর্যন্ত ঐশী-বাণীর মাধ্যমে বলে দেয়া হতো।

ঈসা (আ:)-এর যুগের বাণী : মূসার শরীয়তের পুনর্জীবন

মূসা (আ:)-এর যুগের পর ঈসা (আ:)-এর যুগের আরম্ভ হয়। ঈসা (আ:)-এর যুগই প্রথম যুগ যখন ঐতিহাসিকভাবে সেই আয়াতের দ্বিতীয় অংশের অধীনে চলে আসে অর্থাৎ **মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বিখইরিম মিনহা আও মিসলিহা** (সূরা বাকারা: ১০৭) অর্থাৎ আমাদের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত নির্দেশাদি যখন মানুষের মন থেকে উধাও হয়ে যায় তখন আমরা পুনর্বার সেরকম নির্দেশাদি অবতরণ করি অর্থাৎ দ্বিতীয় বার তা সঞ্জীবিত করি। সেই যুগে এমন একজন নবী এসেছেন যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন নি। বরং তওরাতের কোন কোন বিষয়-বস্তু সেই যুগে সুস্পষ্টভাবে দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত করে দেখান। এজন্যে হযরত ঈসা (আ:)-এর প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: **আইইয়াদনাহু বিরূহিল কুদুস** (সূরা বাকারা: ২৫৪) অর্থাৎ আমরা তাকে পবিত্রাত্মা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম- অনুবাদক) মূসায়ী যুগে শরীয়তের পূর্ণতা হয়েছে এবং এর তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পেতে একটি শক্তিশালী সুশৃঙ্খল বিধানের রূপ লাভ করে। এর কোন দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে ছিলো না। কিন্তু ধীরে ধীরে লোকদের দৃষ্টি শাঁস থেকে সরে গিয়ে খোশার প্রতি পড়লো। অন্যদিকে মানবীয় বোধি তখন সেই মান পর্যন্ত উন্নতি করেছিলো যে, একে সূফী-তত্ত্বেরও শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যকীয় ছিলো। অতএব ঈসা (আ:) আবির্ভূত হলেন যেন এক দিকে তওরাতের নির্দেশাবলী পূর্ণ করেন যেভাবে তিনি স্বয়ং বলেছেন, 'মনে করিও না, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদীগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি, আমি লোপ করিতে আসি নাই কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি (মথি- ১৭:৫)। আর অন্য দিকে তিনি তওরাতের প্রজ্ঞা শিখান লোকদের আর তাদের দৃষ্টি খোশা থেকে সরিয়ে শাঁসের দিকে পরিবর্তন করেন। তিনি বলেছেন, বাহ্যিক শরীয়ত কেবল এ দুনিয়ার জীবন সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে আর গোপন শরীয়তের নির্দেশাবলীতে সহায়তা প্রদান করার জন্যে- নচেৎ আসল বিষয় হলো কেবল অত্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা ও পবিত্রতা। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা হযরত ঈসা (আ:)-এর মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করালেন। তিনি মূসায়ী নির্দেশাবলী দ্বিতীয়বার আসল আকারে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং অন্য দিকে যেসব লোক খোশা বা বাহ্যিকতার পূজারী ছিলো তাদের বললেন, এ বাহ্যিকতার একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থাও আছে। এর প্রতি দৃষ্টি না রাখা হলে তো বাহ্যিকতা অভিশাপের রূপ পরিগ্রহ করে। নামায বড়ই উত্তম ইবাদত । কিন্তু তোমরা কেবল বাহ্যিক নামাযই পড়তে থাকলে অভ্যন্তরীণ নামায যদি না পড় তাহলে সেই নামায অভিশাপে পরিণত হবে। রোযা বড় উৎকৃষ্ট ইবাদত। কিন্তু বাহ্যিক রোযার সাথে অভ্যন্তরীণ রোযা না রাখলে এ বাহ্যিক রোযা অভিশাপের রূপ লাভ করবে। এ কথাই কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বর্ণনা করেছেন- **ওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন**

(সূরা মা'ঊন: ৫) অর্থাৎ কোন কোন নামাযী এমন, যা তাদের জন্যে ধ্বংস ও অভিশাপে পরিণত হয়। মুসলমানদের যেহেতু নবী করীম (স:) সবকিছু সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন, এ কারণে তারা ধোঁকায় পতিত হয়নি। এমন সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়াও হযরত ঈসা (আ:)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঘটে ছিলো। তিনি বলেছিলেন, পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, 'তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি আপন হইতে কিছু বলিবেন না। কিন্তু যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন এবং আগাম ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন" (যোহন- ১৬:১৩)।

রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কথাটিকে ব্যাখা করে দেবার ফলে- এমনকি তিনিও সেই কথাই বলেছিলেন যা মসীহ্ আলায়হেস সালাম বলেছিলেন- মুসলমানদের ধোঁকা লাগেনি আর তারা শরীয়ত অভিসম্পাত হিসেবে নির্ধারণ করে নি বরং কেবল সেই আমলের কারণে শরীয়ত অভিসম্পাত হিসেবে নির্ধারণ করেছে যার সাথে অন্তরের পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও খোদা-ভীতি অন্তর্ভুক্ত না থাকে।

কিন্তু মসীহি জামাত মসীহ্ (আ:)-এর কথায় ধোঁকায় পতিত হয়েছে এবং তাদের আধ্যাত্মিকতা যখন দুর্বল হলো তারা তাদের দুর্বলতার প্রভাবের ফলে ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করলো এবং শরীয়তকে অভিসম্পাত মনে করতে লাগলো। আর এ দিকে মনোনিবেশ করলো না, এ যদি অভিসম্পাত হয় তাহলে হযরত ঈসা (আ:) এবং তাঁর হাওয়ারী (শীষ্য)-গণ রোযা রাখতেন কেন? ইবাদতসমূহ কেন পালন করতেন? মিথ্যা কথা বলা থেকে কেন বিরত থাকতেন? আর এভাবে পুণ্যের অন্যান্য কাজ কেন করতেন? এ অবস্থা থেকে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া যায়, তারা বাহ্যিক ইবাদতকে অভিসম্পাত মনে করতেন না বরং এটা মনে করতেন, বাহ্যিকতার সাথে অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধন যদি না করা হয় তাহলে সেই বাহ্যিকতা অভিসম্পাতে পরিণত হয়।

মোটকথা **আইইয়াদনাহু বিরূহিল কুদুস**- (সূরা বাকারা : ২৫৪)-এর অর্থ হযরত ঈসা (আ:)-এর কাছে পবিত্র অন্তরের বিশেষ রহস্য উন্মোচিত করা হয়েছিল। আর পবিত্রতা ও অভ্যন্তরীণ শিক্ষার গুরুত্ব দানের জন্যে তাদের বিশেষভাবে আদেশ প্রদান করা হয়েছিল। আর বাহ্যিক নির্দেশাবলীর অভ্যন্তরীণ মাহাত্ম্যসমূহ তাদের শিখানো হয়েছিলো এবং সেই যুগে সুফীবাদ পূর্ণতার পথে পদক্ষেপ রাখতে শুরু করেছিলো।

মুহাম্মদী যুগের বাণী : ধর্মীয় সৌধের পরিপূর্ণতা

হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের যুগে ধর্মীয় সৌধ পরিপূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলো। কিন্তু তখনও পরিপূর্ণতা লাভ করে নি। সুতরাং সেই কাজের জন্যে আদম সন্তানদের নেতা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হন। আর এ যুগ **মুহাম্মদী যুগ** নামে পরিচিত।

সব নবীর উৎকর্ষের বিকাশস্থল হলেন মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামঃ

তিনি আদমও ছিলেন। কেননা, তাকে আল্লাহ্ তাআলা নিজ খলীফা মনোনীত করেছেন। আর সার্বিক সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার কাজ তাঁর ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি নূহও ছিলেন। কেননা, তাঁকে বলা হয়েছে- **ইন্না আওহায়না ইলায়কা কামা আওহায়না ইলা নূহিন** (সূরা নিসাঃ ১৬৪)। অতএব নূহ (আঃ) সম্বলিত বাণীও তাঁর ওহীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি (সাঃ) ইব্রাহীমও ছিলেন যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন- **সুম্মা আওহায়না ইলায়কা আনিত্তাবি' মিল্লাতা ইব্রাহীমা হানীফা- ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন** (সূরা নাহ্লঃ ১২৪) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! আমরা তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি ইব্রাহীম হয়ে যাও। কেউ বলতে পারে, হয়ে যাও কথাটি তো একটি নির্দেশ মাত্র। কিন্তু তিনি যে প্রকৃতই ইব্রাহীম হয়ে গিয়েছিলেন এর সাক্ষ্য কি? সুতরাং আমরা বলি এর সাক্ষ্যও কুরআন থেকে লাভ করা যায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন- **কুল হাযিহি সাবীলী আদ'উ ইলাল্লাহি 'আলা বাসীরাতিন আনা ওয়া মনিাত্তাবা'আনী ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন** (সূরা ইউসুফঃ ১০৯)। দেখে নাও সেই **ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন**- সম্বলিত নাম রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ব্যাপারেও এসেছে। আর আল্লাহ্ তাআলা বলে দিয়েছেন, তুমি বিশ্বকে বলে দাও, পরিপূর্ণ একত্ববাদ ও তৌহীদের পতাকাবাহী হওয়ার মাকাম ও মর্যাদা আমারও লাভ হয়েছে। আবার অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা বলোছেন- **কুল ইন্নানী হাদানী রব্বী ইলা সিরাতিম মুসতাক্বীম দীনান কাইয়েমা মিল্লাতা ইব্রাহীমা হানীফা- ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন- কুল ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন- লা শারীকা লাহ ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন** (সূরা আন'আমঃ ১৬২-১৬৪)।

অর্থাৎ লোকদের বলে দাও, আমাকে খোদা সরল-সুদৃঢ় রাস্তার দিকে হেদায়াত দান করেছেন, সেই রাস্তার দিকে যা ইব্রাহীমি পদ্ধতি বলে পরিচিত। আর সে অংশীবাদী ছিলো না। এখানে অংশীবাদী অর্থ সাধারণ অংশীবাদী নয় বরং এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যে নিজ মন-মস্তিকের শক্তিকে আল্লাহ্র পথে নিয়োজিত করে না। আর তার (আল্লাহ্তে) পরিপূর্ণ ভরসা করার সৌভাগ্য লাভ

হয় নি। অতএব যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এটা বলেন, আমাকে আল্লাহ্ তাআলা ইব্রাহীমি পদ্ধতির ওপর পরিচালিত করেছেন তখন প্রশ্ন উঠতে পারতো ইবরাহীম (আ:) তো তার সবটুকু শক্তি আল্লাহ্ তাআলার ওপর সোপর্দ করেছিলেন। আর যখন তাকে বলা হয়েছিলো **আসলিম** তখন তিনি বলে দিয়েছিলেন **আসলামতু লিরব্বিল আলামীন**। তিনিও কি এমন কিছু বলেছিলেন? আল্লাহ্ তাআলা বলেন, বলে দাও সেই কাজ আমিও করেছি। আর আমার নামায ও আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছু সব জগতের প্রভুর জন্যে নিবেদিত। আর আমি এভাবে খোদার হয়ে গিয়েছি অর্থাৎ এখন আমার মস্তিকের কোন অংশে আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারও চিন্তা অবশিষ্ট নেই। মোটকথা এখানে **লা শরীকা লাহূ** এর অর্থ পূর্ণ একত্ববাদের স্বীকৃতি। আর আয়াতটিতে এ-ও বলা হয়েছে, তুমি বলে দাও, এ উন্নত শিক্ষার ওপর পদচারণার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি ইব্রাহীমি শিক্ষা অনুসরণ করে চলছি না বরং সরাসরি সেই শিক্ষা আমি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে লাভ করেছি। আর পুনরায় বলেছেন- আমি ইব্রাহীমি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছি কি নেই, তোমরা তো এ সন্দেহে নিপতিত। কিন্তু সত্য কথা এই, আমি ইব্রাহীমি মর্যাদা থেকেও আগে বেড়ে গিয়েছি। আর আমি বলছি **আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন** অর্থাৎ প্রথম মুসলমান আমি অর্থাৎ ইবরাহীম (আ:)ও **আসলামতু লিরব্বিল আলামীন** এর প্রবক্তা। আর আমিও এ কথাই বলি। যুগের দিক থেকে ইব্রাহীম (আ:) প্রবীণ হওয়ার দাবীদার এবং প্রকাশ্যভাবে তিনি প্রথম মুসলমান হওয়ার দাবীদার। কিন্তু যুগের দিক থেকে আগে আগমন করা কোন বিষয় নয়। মর্যাদার দিক থেকে আগে বাড়া আসল বিষয়। আর এদিক থেকে আমিই প্রথম মুসলমান ও ইবরাহীম আমার পিছনে।

রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাঝে মূসায়ী কামালাত বা উৎকর্ষ ও মূসায়ী গুণাবলীর পূর্ণতা

আবার মূসায়ী কামালত তাঁর (স.) মাঝে পরিদৃষ্ট হয়, যেভাবে সূরা মুয্যাম্মিলে বলা হয়েছে- **ইন্না আরসালনা ইলায়কুম রসূলান শাহিদান আলায়কুম কামা আরসালনা ইলা ফিরআওনা রসূলা**। কিন্তু যেভাবে কুরআন করীম থেকে অবহিত হওয়া যায় এ সাদৃশ্য হুবহু ও বাহ্যিক সাদৃশ্য নয়। বরং উচ্চ সত্তার সাথে সাধারণ সত্তার সাদৃশ্য। যেমন, হযরত মূসা (আ:)-এর মোকাবেলায় রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যে বৈশিষ্ট্যাবলী লাভ হয়েছে

ওগুলোকেও কুরআন করীম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা যাচ্ছে:

(১) খোদা তাআলা মূসা (আ:) সম্বন্ধে তো এটা বলেছেন, আমরা মূসাকে এমন একখানা গ্রন্থ দিয়েছি যা **তফসীলাল্লি কুল্লি শায়ইন** অর্থাৎ সব বিষয়ের ব্যাখ্যাদানকারী ছিল (সূরা ইউসুফ: ১১২)। আর এখানে এটা বলেছেন **মা কানা হাদীসাইউফতারা ওয়া লাকিন তাসদীকাল্লাযী বায়না ইয়াদায়হি ওয়া তাফসীলা কুল্লি শায়ইঁওয়া হুদাঁওয়া রহমাতাল্লি কাওমিইউ'মিনূন** (সূরা ইউসুফ: ১১২) অর্থাৎ এটা কখনো এমন কথা নয় যা স্বরচিত, বরং এর পূর্বে যা আছে এর সত্যায়নকারী এবং সব বিষয়ের পূর্ণ ব্যাখ্যাদানকারী ও যারা ঈমান আনে তাদের জন্যে হেদায়াত ও রহমতস্বরূপ- অনুবাদক) অর্থাৎ তোমরা যদি একথা বলো, মূসা (আ:)-এর যখন একখানা ব্যাখ্যাদানকারী হেদায়তনামা লাভ হয়েছে কিন্তু এরপর এখন তোমরা যে শিক্ষাকে পেশ করছো তা মিথ্যে আর সেক্ষেত্রে এর জবাব এই, এটা মিথ্যে নয় বরং পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এ প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী মজুদ রয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছে এবং এত সব আদেশ-নিষেধ মজুদ আছে আর এটা মু'মিনদের জন্যে পথপ্রদর্শন ও অনুগ্রহের কারণ। অতএব যে গ্রন্থের সংবাদ স্বয়ং মূসা (আ:)-এর গ্রন্থ প্রদান করেছে তা কি করে ব্যর্থ হতে পারে? নিশ্চয় এতে অধিক সৌন্দর্যসমূহ নিহিত আছে। তখনই তো মূসা (আ:)-এর গ্রন্থ এর আশ্বাস দিয়েছে। নচেৎ মূসা (আ:)-এর গ্রন্থের পর এর কিইবা প্রয়োজন ছিল।

(২) আবার মূসা (আ:) তো এটা বলেছিলেন **রব্বি আরিনী আনযুর ইলায়কা** অর্থাৎ হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে দর্শন দান করো যেন আমি তোমার প্রতি তাকাতে পারি (সূরা আ'রাফ: ১৪৪)। আর আল্লাহ্ তাআলা এর যে জবাব দিলেন তা সার্বিক জবাব। কোন কোন লোক বলে, খোদা তাআলা স্বয়ং হযরত মূসা (আ:)-কে দর্শন দান করেছিলেন। আর কোন কোন লোক বলে, দর্শন দান করেননি। কিন্তু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লাম কখনো আল্লাহ্ তাআলার কাছে এটা বলেননি, হে খোদা! তুমি আমাকে তোমার সত্তা প্রদর্শন করো বরং আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেছেন, আমরা তাকে আমাদের মুখমন্ডল দেখিয়ে দিয়েছি। অতএব মূসা (আ:)-এর ব্যাপারে তো কেবল আমাদের ধারণা, তিনি আল্লাহ্ তাআলাকে দেখেছিলেন। কিন্তু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেন, **দানা ফাতাদাল্লা ফা কানা কা'বা কাওসায়নে আও আদনা** অর্থাৎ এরপর সে (আল্লাহ্র) নিকটবর্তী হলো, তখন তিনিও (মুহাম্মদের প্রতি) নিচে নামলেন। অত:পর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেল বা তা থেকেও নিকটতর হয়ে গেল (সূরা

নাজমঃ ৯-১০)। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) এবং আমরা এভাবে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গেলাম যেভাবে একটি ধনুক অপর একটি ধনুকের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায়। আর এর প্রত্যেকটি প্রান্ত অন্যান্য প্রান্ত থেকে দৃশ্যমান হয়। যেন মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের কাছে এসে গেলেন এবং এত কাছে হয়ে গেলেন যেভাবে ধনুকের সীলাদ্বয় সামনাসামনি হয়ে যায়। এমনিভাবেই মুহাম্মদ (সঃ) আর আমি সামনাসামনি হয়ে গেলাম এবং আমাদের উভয়ের মাঝে যোগাযোগ হয়ে গেলো। মোটকথা মূসা (আঃ) যে বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তাথেকে বেড়ে গিয়ে রসূলে করীম (সঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং দর্শন দিলেন।

(৩) আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর চেয়ে আ হযরত (সঃ)-কে এ বৈশিষ্ট্য প্রদান করলেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গে তো একথা বলা হয়েছে, **কাল্লামাল্লাহু মূসা তাকলীমা** অর্থাৎ আল্লাহ্ মূসা (আঃ)-এর সাথে অনেক বাক্যালাপ করেছিলেন (সূরা নিসাঃ ১৬৫)। আঁ হযরত (সঃ)- এর প্রসঙ্গে বলেছেন **ইন্না আওহায়না ইলায়কা কামা আওহায়না ইলা নূহিন ওয়ান্নাবীঈনা মিম বা'দিহী ওয়া আওহায়না ইলা ইব্‌রাহীম ওয়া ইসমাঈলা ওয়া ইসহাকা ওয়া ইয়াকূবা ওয়াল আসবাতি ওয়া ঈসা ওয়া আইউবা ওয়া ইউনূসা ওয়া হারূনা ওয়া সুলায়ামানা ওয়া আতায়না দাউদা যাবূরা-ওয়া রসূলান ক্বাদ কাসাসনাহুম আলায়কা মিন কাবলু ওয়া রুসুলান লাম নাকসুসহুম আলায়কা ওয়া কাল্লামাল্লাহু মূসা তাকলীমা** অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি ওহী করেছি যেরূপে আমরা নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী করেছিলাম। আর আমরা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও (তার) বংশধরগণ এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়ামানের ওপর ওহী করেছিলাম। আর দাউদকে আমরা যবূর দিয়েছিলাম। এবং (আমরা প্রেরণ করেছি) এমন অনেক রসূল যাদের বৃত্তান্ত ইতোপূর্বে আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করেছি। আর এমন অনেক রসূল (পাঠিয়েছি) যাদের কথা তোমার কাছে বর্ণনা করি নি। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে অনেক বাক্যালাপ করেছিলেন (সূরা নিসাঃ ১৬৪-১৬৫)। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সঃ) আমরা তোমার প্রতি নূহের ন্যায় ওহী অবতীর্ণ করেছি এবং সেসব নবীদের ন্যায়ও ওহী অবতীর্ণ করেছি যারা এর পরে এসেছিলো। আমরা তোমাকে ইবরাহীমের গুণাবলীও দিয়েছি এবং ইসমাঈলের গুণাবলীও দিয়েছি আর ইসহাকের গুণাবলীও দিয়েছি এবং ইয়াকূবের গুণাবলীও দিয়েছি আর ইয়াকূবের সন্তানদের গুণাবলীও দিয়েছি। ঈসার গুণাবলীও দিয়েছি। আর আইউব, ইউনূস, হারূন ও সুলায়মানের গুণাবলীও দিয়েছি। আর দাউদকে যে যবূর দিয়েছিলাম তা-ও আমরা তোমাকে দিয়েছি এবং মূসার সাথে যেভাবে আমরা বিশেষভাবে সরাসরি বাক্যালাপ করেছিলাম সেই পুরস্কারও

আমরা তোমাকে দান করেছি। এতে বলা হয়েছে, মুহাম্মদী ওহী মূসা এবং অন্যান্য নবীগণের ওহীর সম্মিলিত রূপ। এতে সেসব সৌন্দর্যই নিহিত আছে যা নূহ (আ:) এবং অন্যান্য নবীগণের ওহীতে নিহিত ছিলো। আবার মূসা (আ:)-এর ওহীর মত 'কালামে লফ্যী' বা শাব্দিক বাক্য বরং এতে মূসায়ী ওহী থেকে একটি অধিক কথা এটা আছে যে, মূসার ওপর যে বাণী অবতীর্ণ হতো তা মূসা (আ:) নিজ ভাষায় লোকদের সামনে বর্ণনা করতেন। যেভাবে আমরা কাউকে বলি, তুমি যাও এবং অমুক ব্যক্তিকে বলো, যায়েদের জ্বর হয়েছে। তখন অবিকল সম্ভাবনা আছে যে, সে যাবে এবং যায়েদ, মনে করুন তার ভাই বা বাপ। সে ক্ষেত্রে সে এটা বলার পরিবর্তে যে, যায়েদের জ্বর হয়েছে বলবে, আমার ভাই বা বাবার জ্বর হয়েছে। এভাবেই হযরত মূসা (আ:)-এর যুগে তাই 'লফ্যী কালাম' বা শাব্দিক বাক্য অবতীর্ণ হতো। কিন্তু হযরত মূসা (আ:) ভাষায় লোকদের কাছে তা পৌঁছাতেন। কিন্তু যেহেতু রসূলে করীম (স:)-এর যুগে (আধ্যাত্মিক যুগ- অনুবাদক) উন্নতি এর শীর্ষস্থান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো এবং তখন এমন একটি শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার ছিলো যা শেষ যুগের পরিপূর্ণ শরীয়ত বা বিধান। এজন্যে প্রয়োজন ছিলো যেন সেই ওহীর কথাগুলোও সংরক্ষণ করা হয়। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন- **ইন্না 'আলায়না জামা'আহূ ওয়া কুরআনাহূ ফা ইযা ক্বারাআ'নাহু ফাত্তাবি' কুরআনাহূ**- অর্থাৎ নিশ্চয় এটা সংকলন করার ও পাঠ করে শুনাবার দায়িত্ব আমাদের ওপর। অতএব এটা যখন আমরা পাঠ করি তখন তুমিও এ পাঠের অনুসরণ করো (সূরা কিয়ামা: ১৮-১৯) অর্থাৎ মূসার যুগে তো আমরা বাণী অবতীর্ণ করতে ছিলাম আর সে নিজের ভাষায় আবার সেই বাণীর বিষয়-বস্তু ও তাৎপর্যকে লিখে নিতো। প্রকৃতপক্ষে বিষয়-বস্তু আমাদেরই হয়ে থাকতো। কিন্তু ভাষা মূসার হতো। কিন্তু তোমার সাথে আমাদের চালচলন এ রকম নয়। বরং একে একত্র করা এবং একে পাঠ করে দেয়াও আমাদের কাজ। যে কথা আমরা বলি তা-ই পাঠ করো এবং একেই লিখে নাও। নিজের পক্ষ থেকে এর অনুবাদ করবে না। এভাবে বলেছেন **ইন্না নাহনু নায্যালনায্ যিক্রা ওয়া ইন্না লাহূ লা হাফিযূন** [অর্থাৎ নিশ্চয় আমরাই এ যিক্র (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হিফাযতকারী বা রক্ষক (সূরা হিজর: ১০)]। আমরাই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি। আর আমরাই এর কথা ও অভ্যন্তরীণ তাৎপর্যের রক্ষাকারী। মুহাম্মদ (স:)-এর ওপর এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নেই।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও ঈসায়ী বৈশিষ্ট্যাবলী

তদুপরি তাঁর (স:) মাঝে ঈসায়ী বৈশিষ্ট্যাবলীও দেখতে পাওয়া যায়। ঈসায়ী বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন- **ওয়া আইয়্যাদানাহু বিরূহিল কুদুস** অর্থাৎ আমরা তাঁকে রূহুল কুদুসের (পবিত্রাত্মা- অনুবাদক) মাধ্যমে শক্তি দান করেছিলাম (সূরা বাকারা: ২৫৪)।

এ মোকাবেলায় আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (স:)-এর প্রসঙ্গে বলেন- **কুল নায্যালাহ্ রূহুল কুদুসি মির্ রব্বিকা বিল হাক্কি লিউসাব্বিতাল্লাযীনা আমানূ ওয়া হুদাঁওয়া বুশরা লিল্ মুসলিমীন** (সূরা নাহল: ১০৩) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (স:)! তুমি লোকদের বলে দাও, খোদা তাআলা এ বাণী রূহুল কুদুস (জিব্রাঈল)- এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন সত্যতা ও হকের সাথে যেন এ মু'মিনদের সুদৃঢ় করে এবং এতে বিশ্বাস আনয়নকারীদের জন্যে হেদায়াত (পথ-নির্দেশনা) ও সুসংবাদ রয়েছে।

আবার হযরত ঈসা (আ:) যে বলেছিলেন, শরীয়ত হলো অভিশাপ। এ দিয়ে তার এটা বলা উদ্দেশ্য ছিলো, শুধুমাত্র বাহ্যিকতার পিছনে পড়ে থাকা এবং অভ্যন্তরীণ সংশোধন পরিহার করা এক প্রকারের অভিশাপ। এদিক থেকে কুরআন করীমও বলেছে- **ওয়ায়িলুল্লিল মুসাল্লিনাল্লাযীনাহুম 'আন সলাতিহিম সাহূনাল্লাযীনাহুম ইউরাউনা** (সূরা মাঊন) অর্থাৎ সেসব নামাযীদের ওপর অভিসম্পাত এবং শাস্তি যারা নামাযের আত্মা সম্বন্ধে অমনোযোগী। আর নামায কেবল লোকদের দেখানোর জন্যে পড়ে থাকে। এ সেই **ওয়ায়েল** (অভিসম্পাত) শব্দই যা হযরত ঈসা (আ:) নিজ যুগে ব্যবহার করতে গিয়ে বলেছেন, কেবল শরীয়তের বাহ্যিক অনুসরণ অভিশাপ। তার একথা বলার উদ্দেশ্য এটা ছিলো না, নামায অভিশাপ বা রোযা অভিশাপ অথবা সদকা খয়রাত করা অভিশাপ বা গরীব ও মিসকীনদের দেখাশুনা করা অভিশাপ বরং তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য ছিলো, বাহ্যিকভাবে পুণ্যকর্ম করা এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি সেই পুণ্য কর্মের প্রভাব সৃষ্টি না হওয়া অভিশাপ। কিন্তু খৃষ্টানগণ ভুলে এ উদ্দেশ্য বুঝে নিলো, নামায অভিশাপ, রোযা অভিশাপ। এমনিভাবে কুরআন বলেছে- **লাইঁনালাল্লাহা লাহূমুহা ওয়ালা দিমাউহা লাকিইঁয়্যানালুহুত্তাকওয়া মিনকুম** (সূরা হাজ্জ: ৩৮) অর্থাৎ তোমরা যে বাহ্যিক কুরবানী করে থাকো তা খোদা তাআলা পর্যন্ত পৌঁছে না বরং খোদা তাআলার কাছে সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা পৌঁছে যার প্রেরণায় সেই কুরবানী করা হয় আর সেই ঐশী-ভালবাসা পৌঁছে যা সেই কুরবানীর প্রেরণা যোগায়। এ শিক্ষাই হযরত ঈসা (আ:)-ও দিয়েছিলেন।

রসূলগণের বৈশিষ্ট্যাবলীর উৎকর্ষের সমাহার

মোটকথা রসূলে করীম (স:) ছিলেন সব রসূলের পরিপূর্ণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিকাশস্থল। তাঁর (স:) মাঝে ইবরাহীম (আ:)-এর গুণাবলীও ছিল। তাঁর (স:) মাঝে নূহ (আ:)-এর গুণাবলীও ছিল। তাঁর মাঝে মূসা (আ:)-এর গুণাবলীও ছিল এবং তাঁর মাঝে ঈসা (আ:)-এর গুণাবলীও ছিল। আবার সেসব গুণকে একত্র করার পর তাঁর (স:) মাঝে একনিষ্ঠভাবে মুহাম্মদী গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীও নিহিত ছিল। যেন সব নবীর গুণের সমাহার ঘটেছিলো আবার এ ছাড়াও তাঁর (স:) নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীও ছিলো। অতএব তিনি যে ধর্ম নিয়ে আসেন তা সম্মিলিত বিশ্ব-ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর উপস্থিতিতে বাকী ধর্মগুলোর কোন ধর্মেরই অনুসরণ করার আর প্রয়োজন থাকলো না।

'আল্ ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম' আয়াতের অর্থ

এজন্যে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন– **আল্ ইয়াওমা ইয়াইসাল্লাযীনা কাফারূ মিন দীনিকুম ফালা তাখশাওহুম ওয়াখশাওনি– আল্ ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু 'আলায়কুম নিয়'মাতী ওয়া রাযীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা** অর্থাৎ যারা অস্বীকার করেছে তারা আজ তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছে। সুতরাং তাদের ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম পরিপূর্ণ করলাম আর তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে ধর্মরূপে মনোনীত করলাম (সূরা মায়েদা : ৪ আয়াতাংশ)।

কাফিরগণ নিরাশ হয়ে গিয়েছে যে, এখন এ ধর্মের ওপর বিজয় লাভ করা অসম্ভব। তারা এর মোকাবেলায় কোন কিছুই পেশ করতে পারে না। অতএব কাফির নিজ শক্তি দ্বারা জয় লাভ করে এ ধারণা এখন করা যেতে পারে না। অবশ্য এ ধারণা সব সময়েই বিদ্যমান, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অমনোযোগী হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সাহায্য ও সমর্থন ফিরিয়ে নিবেন। অতএব একে ভয় করো এবং ভালভাবে এটা উপলব্ধি করো যে, কুরআনের বিদ্যমানতায় কাফির কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। হ্যাঁ, এটা হতে পারে, তোমরা কুরআন পরিত্যাগ করো এবং বিনাশপ্রাপ্ত হও। অতএব **ফালা তাখশাওহুম ওয়াখশাওনি** অর্থাৎ একে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো। এখন প্রশ্ন এই, কাফিরগণ কেন নিরাশ হয়ে গেছে? এর উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে:

(১) ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। ধর্মের পরিপূর্ণতার অর্থ শরীয়তের অবতরণ এবং এর প্রতিষ্ঠা। কেননা, কার্যকরী হওয়ার মাধ্যমে ধর্ম পরিপূর্ণতা

লাভ করে থাকে। এর দৃষ্টান্ত এমনই, যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের সব ছাত্রই শৈল্য বিদ্যার পুস্তকাদি তো পড়ে থাকে কিন্তু পুস্তকাদি পড়লে কি হবে তারা অস্ত্রপচার করতে পারে না। বরং এটা বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে করতে পারে। আমাদের দেশে একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী আছে। গত শতাব্দীতে পাঞ্জাবের যে রাজা ছিলেন মহারাজা রণজিৎ সিং। তার দরবারে দিল্লী থেকে কোন একজন হেকিম এলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে খুব বেশি পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু তখনও তার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হয়নি। মহারাজা রণজিৎ সিং-এর একজন মুসলমান মন্ত্রীও ছিলো। তিনি একজন হেকিমও ছিলেন। এজন্যে মন্ত্রীর কাজ ছাড়াও চিকিৎসকের কাজও তার কাছ থেকে নেয়া হতো। বরং পূর্ণ বিশৃঙ্খলতার যুগে কৌশলের কারণেই তিনি রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন। আগমনকারী হেকিম তার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্যে মন্ত্রীকে অনুরোধ জ্ঞাপন করলো এবং মন্ত্রী ভদ্রতার কারণে তা অস্বীকার করতে পারলো না বরং মহারাজার কাছে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলো। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলে দিলো, হুযূর চিকিৎসা শাস্ত্রে এ হেকিম সাহেব অনেক বুৎপত্তি লাভ করেছেন। হুযূর যদি আশ্রয় দান করেন তাহলে হুযূরের বদান্যতায় তার অভিজ্ঞতাও লাভ হয়ে যাবে। মহারাজা রণজিৎ সিং খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তৎক্ষণাৎ মাহাত্ম্যটা উপলব্ধি করতে পারলেন এবং বল্লেন, মন্ত্রী মহোদয়! ইনি শাহী শহর দিল্লী থেকে আসছেন না? তার মর্যাদা দেয়া আমাদের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু কী অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে তার গরীব রণজিৎ সিংহের প্রাণটা দৃষ্টিতে এলো? তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়ে দাও এবং বিদায় করে দাও যেন অন্য কোথাও গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এটা একটি কাহিনী। কিন্তু এতে শিক্ষা রয়েছে। বিনা অভিজ্ঞতায় জ্ঞান কোন কাজে আসে না। আর শরীয়তের জ্ঞানও এর বহির্ভূত নয়। সুতরাং শরীয়তও যখন কার্যে প্রয়োগ না হয় এর বিস্তারিত বিবরণের পাত্তা পাওয়া যায় না এবং এটা পরিপূর্ণও হতে পারে না। অতএব ধর্মের পরিপূর্ণতা দিয়ে সেই ধর্মীয় বিধি-বিধান অবতীর্ণ হওয়া আর পুনরায় এটা কার্যেও প্রয়োগ হওয়া বুঝায়। (২) এভাবে বলা হয়েছে, কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে যে, নেয়ামত (কল্যাণ) পূর্ণ হয়ে গেছে এবং নেয়ামতের পূরিপূর্ণতা এভাবে হয় যেন দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণসমূহে পরিপূর্ণ প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং উভয় প্রকার নেয়ামত লাভ হয়ে যায়। আর কোন ব্যক্তির যখন কোন কাজের সুফল লাভ হয় তখন তার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই করা যেতে পারে না। এক কলেজের শিক্ষার পরে ডিগ্রী পাওয়া গেলে এবং এক বিভাগের চাকুরীর পরে সরকার থেকে পুরস্কার লাভ হলে কে সন্দেহ করতে পারে যে, কলেজ মিথ্যে এবং সেই বিভাগ

জালিয়াত? এভাবেই যখন কোন ধর্মের ওপর কাজ করার ফলে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণসমূহ লাভ হতে থাকে এবং এভাবে মানুষ সব রকম কল্যাণ লাভ করে তখন কে এর সত্যতা অস্বীকার করতে পারে?

নেয়ামত কী?

এখন আমরা কুরআন থেকে দেখি নেয়ামত কী? কুরআন করীম বলে, **ওয়া ইয কৃলা মূসা লিক্বওমিহী ইয়া ক্বওমীযকুরূ নি'মাতাল্লাহি আলায়কুম ইয জা'আলা ফীকুম আম্বিয়ায়া ওয়া জা'আলাকুম মুলূকাঁওয়া আতাকুম মালাম ইউ'তি আহাদাম্মিনাল 'আলামীন'** (সূরা মায়েদা, ৪র্থ রুকূ) অর্থাৎ স্মরণ করো যখন মূসা নিজ জাতিকে বল্লো, হে আমার জাতি, খোদা তাআলার নেয়ামত স্মরণ করো যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। তিনি তোমাদের মাঝ থেকে নবী বানিয়েছেন এবং পুনরায় তোমাদের রাজত্বও দিয়েছেন। পরে তোমাদের শিক্ষাও দিয়েছেন যা তোমরা পূর্বে অবহিত ছিলে না। এথেকে জানা যায়, নেয়ামত বলতে বুঝায় (১) নবুওয়তের পদ্ধতি প্রবর্তন (২) রাজত্ব (৩) অন্যান্য ধর্ম থেকে উৎকৃষ্টতর শিক্ষা। কেননা, **জা'আলা ফীকুম আম্বিয়ায়া** থেকে নবুওয়তের প্রবর্তনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। **জা'আলাকুম মুলূকান-** থেকে রাজত্বের এবং **আতাকুম মা লাম ইউ'তি আহাদাম্মিনাল 'আলামীন** থেকে সেই বিষয়ের এমন জ্ঞান লাভ হয় যা অন্যান্য ধর্ম থেকে উৎকৃষ্টতর এবং মানুষ এতে গর্ব করতে পারে।

কোন কোন ধর্মের জন্যে রাজত্বের অস্তিত্ব জরুরী

এখন কেউ যদি বলে, রাজত্ব কি করে ধর্মীয় দিক থেকে নেয়ামত হতে পারে? তাহলে এর জবাব এই। যেসব ধর্মের শরীয়তের সীমানা রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি সম্বলিত আদেশ-নিষেধ পর্যন্ত বিস্তৃত এদের জন্যে রাজত্ব আবশ্যক। রাজত্ব যদি না হয় তাহলে সেসব ধর্মীয় আদেশ-নিষেধের প্রচলন কিভাবে হয় যা রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক রাখে? অতএব এখানে রাজত্ব বলতে ধর্ম থেকে বঞ্চিত রাজত্ব বুঝায় না। ধর্ম-বিহীন রাজত্ব তো একটি অভিশাপের শামেল। এখানে রাজত্ব বলতে সেই রাজত্ব বুঝায় যা শরীয়তের বিধি-বিধানকে প্রচলন করে। যেভাবে দাউদ (আ:)-এর রাজত্ব লাভ হয়েছিলো বা সুলায়মান (আ:)-এরও রাজত্ব লাভ হয়েছিলো। আর তাঁরা নিজেদের আমল দিয়ে শরীয়তের রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদেশ-নিষেধকে প্রচলন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অতএব যে শরীয়তের পরিসীমার মাঝে সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনুশাসন

থাকে একে প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্যই রাজত্বও দিয়ে দেয়া হতো। কেননা, রাজত্ব যদি না দেয়া হতো তাহলে শরীয়তের একটি অংশ বোধগম্য হওয়া তাদের জন্যে কষ্টকর হতো। যেমন দেখো, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে যেহেতু খোদা তাআলা রাজত্ব দান করেছিলেন–আমাদের যখন কোন মসলা সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তখন আমরা দেখে নিই মুহাম্মদ (স:) একাজ কিভাবে করেছিলেন। এ জন্যে সুন্নত আমাদের কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়। তাঁর (স:) যদি রাজত্ব লাভ না হতো তাহলে রাষ্ট্রনৈতিক, বিচার বিষয়ক ও বহু সাংস্কৃতিক ব্যাপারাদিতে কেবল তাঁর (স:) শিক্ষা মজুদ থাকতো অথচ তাঁর (স:) আমলের মাধ্যমে সঠিক প্রয়োগ আমরা জানতে পারতাম না। সুতরাং এটা বিশেষ জরুরী এবং আল্লাহ্‌র সুন্নত এভাবে প্রচলিত রয়েছে, এরূপ শরীয়ত যা রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতি নির্ভরশীল এর প্রারম্ভে রাজত্ব লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং **জা'আলাকুম মুলূকান** দিয়ে সেই রাজত্ব বুঝায় যা ধর্মের বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত করার জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদান করা হয় এবং যার প্রবর্তন কখনো কখনো প্রত্যাদিষ্ট নয় এমন খিলাফতের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। মোটকথা আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে বলেছেন, তোমাদের (১) প্রত্যাদিষ্ট খিলাফত (২) প্রত্যাদিষ্ট নয় এমন খিলাফত এবং (৩) উত্তম শরীয়ত লাভ হয়েছে। আর এটাই নেয়ামত। অতএব যখন রসূলে করীম (স:) সম্বন্ধে বলা হয় **আতমামতু আলায়কুম নি'মাতী–** তখন এর অর্থ এই হয় (১) তাঁর (স:) উম্মতে নবুওয়তের প্রচলন থাকবে (২) সত্যিকার অর্থে খিলাফতের প্রচলন থাকবে (৩) এবং তাঁকে (স:) উত্তম শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। পুনরায় তাঁর প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **ইন্না নাহনু নায্‌যালনায্ যিক্‌রা ওয়া ইন্না লাহূ লা হাফিযূন** (সূরা হিজর: ১০) অর্থাৎ তোমার ওপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে এতে কারও প্রবেশাধিকার নেই। এ শাব্দিকভাবে ইলহাম এবং আমরা এর হেফাযত (সংরক্ষণ) করতে থাকবো। অতএব যে শিক্ষার সংরক্ষণ করা হয় এর অর্থ এটা ভবিষ্যতেও শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বিখয়রিম্মিনহা আও মিসলিহা** অর্থাৎ কোন বাণী রহিত হলে তাথেকে উৎকৃষ্টতর নিয়ে আসা হয়। এথেকে এ-ও বুঝা যায়, যে বাণী রহিত করা হয় না তা থেকে উৎকৃষ্টতর কোন বাণী নেই। অতএব জানা গেল, কুরআন করীম কেবল বিগত সব ঐশী গ্রন্থাদি থেকে উত্তম নয় বরং সর্বকালের জন্যে উত্তম হয়ে থাকবে এবং এর রহিত হওয়ার প্রশ্নই কখনো সৃষ্টি হবে না। কুরআন করীম এবং অবশিষ্ট গ্রন্থাদির দৃষ্টান্ত এমনই। এর তুলনা এমনই যেভাবে কাবুল সরকারেরও

বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে এবং বৃটিশ সরকারেরও বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। কিন্তু কাবুল সরকারের মোকাবেলায় বৃটিশ সরকার অধিক শক্তিশালী এবং অধিক কল্যাণজনক কাজে লিপ্ত। এভাবে অন্যান্য গ্রন্থাদিও যদিও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু কুরআন করীমের শিক্ষা এসবের শিক্ষা থেকে অধিক উন্নত ও সর্বদাই উন্নত হয়ে থাকবে।

ইসলামের মহান বিপ্লব

অতএব এ দুটো আয়াত থেকে এ মহান বিপ্লবের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটা ইসলামের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ (১) নবুওয়তের প্রচলন (২) খিলাফতের প্রচলন এবং (৩) উত্তম শিক্ষা। এটা যদি বলা যায়, এ কথা মূসা (আ:)-এর ব্যাপারেও এসেছে তাহলে পরে এটা মূসা (আ:)-এর শিক্ষা থেকে কি করে উন্নততর হয়? সেক্ষেত্রে এর জবাব এই। এ প্রমাণ থেকে যে, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, **মা নানসখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বিখয়রিম্মিনহা আও মিসলিহা** অর্থাৎ যে শিক্ষা পুর্ববর্তী শিক্ষাকে রহিত করে দেয় তা উৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে। যেহেতু মুহাম্মদী শিক্ষা মূসায়ী শিক্ষাকে রহিত করে দিয়েছে তাই এ ফরমূলা বা নীতি অনুযায়ী তা থেকে এটা উৎকৃষ্টতর। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, এতো হলো নেয়ামতের কথা। কিন্তু আয়াতে তো নেয়ামতের পুর্ণতার কথা বলা হয়েছে। অতএব খোদা তাআলা নেয়ামত তো দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ণ নেয়ামত কি করে হলো? এক্ষত্রে এর জবাব এই আয়াতেই রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **ওয়া মাইঁউতিইল্লাহা ওয়ার রসূলা ফাউলায়েকা মাআল্লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলায়হিম মিনান্নাবীঈনা ওয়াসসিদ্দিকীনা ওয়াশ্ শুহাদাই ওয়াস সলেহীন-ওয়া হাসুনা উলায়েকা রফীক্বা** (সূরা নিসা, রুকূ ৯) অর্থাৎ সেসব লোক যারা খোদা ও মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে আল্লাহ্ তাআলা তাদের নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

এ আয়াতে বলা হয়েছে শরীয়তের অবতরণের পরে লোকদের মাঝে শরীয়ত ভুলে যাওয়ার ব্যাধি সৃষ্টি হয় এবং ঐশী শিক্ষা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা কোন কাজে আসে না। এ দিয়ে কোন শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বকে যদিও অস্বীকার করা যেতে পারে না এবং তারা এর ওপর আমল করে বা না করে এটা স্বয়ং বান্দাদের আয়ত্তাধীন । কিন্তু যেহেতু এহেন ব্যাধির আশঙ্কা সব সময় হতে পারে তাই আমরা বলে দিচ্ছি, এমন আশঙ্কাসমূহের সময়ে ইসলামের বাইরের থেকে কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই; বরং এ ঐশী শিক্ষা দুর্বলতার প্রতিকার ও প্রতিবিধান সৃষ্টি করে নেবে। আর মুহাম্মদ (স:) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া

সাল্লামের উম্মতের দুর্বলতা স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শীষ্যত্বের মাধ্যমে দূর হয়ে যাবে।

এতে কোন সন্দেহ নেই, ঐশী শিক্ষা বিস্মৃতি হওয়ার প্রতিবিধান মূসা (আ:)-এর সময়েও হয়েছে। কিন্তু এ সময়ে বাইরে থেকে চিকিৎসক প্রেরণ করা হতো। অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে দাঁড় করানো হতো যিনি মূসার উম্মতের মাঝ থেকেই যদিও হতেন; কিন্তু তার নবুওয়তের পদ লাভ সরাসরি হতো। কিন্তু মুহাম্মদ (স:)-এর উম্মতের সাথে এ প্রতিশ্রুতি করা হয়েছিলো, এতে যখনই কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হয় তখন তাঁর (স:) কোন গোলামই এ দুর্বলতা দূর করার জন্যে দাঁড়িয়ে যাবেন। মোটকথা আগামীতে যে (আধ্যাত্মিক) ব্যাধি সৃষ্টি হবে এর প্রতিকার মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা থেকেই বের হবে।

ইসলামী শিক্ষা উত্তম হওয়ার প্রমাণ

এখন আমি ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি:

কিতাব বা ঐশী গ্রন্থের সাথে হিকমত বা প্রজ্ঞার বর্ণনা

ইসলামে আদেশ-নিষেধ যুক্তি-প্রমাণের সাথে বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পূর্ণ তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিত্তি স্বয়ং আসল গ্রন্থে রচনা করা হয়েছে। ইহুদীদের ন্যায় অন্য কোন নবীর দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন সৃষ্টি হয় না। কুরআন মজীদের পূর্বে যে ঐশী গ্রন্থ ছিলো ওগুলোতে আদেশ-নিষেধ তো জারী হতো। কিন্তু সাধারণত এদের সমর্থনে যুক্তি-প্রমাণ দেয়া হতো না। উদাহরণস্বরূপ, এটাতো বলা হতো, নামায পড়। কিন্তু কেন নামায পড়বে, এতে কী কল্যাণ রয়েছে এবং এর উদ্দেশ্যই বা কী এটা বলা হতো না? কিন্তু কুরআন করীম যেখানে উপদেশ দেয়, সেখানে এ আদেশ-নিষেধের যুক্তি-প্রমাণও দেয়া হয়। আর এর কল্যাণসমূহও বর্ণনা করা হয়। এভাবে তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিত্তি স্বয়ং কুরআন করীমে এসে গেছে। আর এজন্যে আলাদা কোন নবীর প্রয়োজন থাকে না, যেভাবে ইহুদীরা হযরত মসীহ (আ:)-এর প্রয়োজন অনুভব করেছিলো।

মধ্যপন্থী শিক্ষা

দ্বিতীয়ত কুরআন মধ্যপন্থী শিক্ষা নিয়ে আগমন করেছে। এটা সব অবস্থায় উপযোগী। আর যেখানেই মানবীয় শক্তিতে পার্থক্য দেখা দেয় সেই অবস্থায় উদ্ভূত সমস্যার সমাধানও এতে মজুদ আছে।

খোদা তাআলা এবং বান্দার সাক্ষাৎ সম্পর্ক

এতে পুরোহিত প্রথাকে (Priesthood) মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ খোদা তাআলা ও বান্দার মাঝে ঐশী ইবাদতের ব্যাপারে পাদ্রী ও পন্ডিতদের মধ্যস্থতার ধারণা কুরআন মাজীদ একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছে। মূসায়ী ও ঈসায়ী বিশ্বাসে এর ওপর খুবই জোর দেয়া হতো। কিন্তু এখন প্রত্যেক মু'মিন আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে। আর কোন বিশিষ্ট মৌলবীকে ডেকে নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিপ্লবও প্রকৃতপক্ষে ছিলো একটি মহান বিপ্লব । কেননা, পৃথিবী হাজার হাজার বছর ধরে এ কয়েদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু কুরআন মাজীদ একে এক মুহূর্তে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আর বলে দিয়েছে, ইবাদতে কোন মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।

ইসলামের এ শিক্ষা খৃষ্টানদের জন্যে খুবই বিস্ময়কর। তারা কয়েকবারই এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, আপনাদের মাঝে পুরোহিত ও পাদ্রী না থাকলে আপনারা কিভাবে ইবাদত করে থাকেন?

ইবাদতের মকাম ও মর্যাদা ব্যাপকতর করে দিয়েছে

চতুর্থত ইসলাম ইবাদতের সীমারেখার গন্ডীকে উড়িয়ে দিয়েছে। আর ইবাদতের স্থান কেবল ব্যবস্থাপনার জন্যেই থেকে গেল। ইবাদতের জন্যে স্থান নির্ধারিত হয় নি। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুদের মন্দির, খৃষ্টানদের গীর্জাগুলো ইবাদতের জন্যে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এলেন তখন তিনি বল্লেন, *জু'ইলাত লীয়াল আরযু মাসজিদান* অর্থাৎ গোটা ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্যে মসজিদ করা হয়েছে। এর আগে যত নবী আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের শিক্ষায় এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেয়া হতো যেন ইবাদত বিশেষ বিশেষ স্থানে করা হয়। যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এলেন তখন খোদা তাআলা তাঁর (স:) মাধ্যমে সারা ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ বানিয়ে দিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে পূর্বতন নবীদের ধর্ম যেহেতু সীমাবদ্ধ ছিলো তাই খোদা তাআলা ইবাদতের স্থানকেও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন খোদা তাআলা ভূপৃষ্ঠের সব অংশকে পাক-পবিত্র করার জন্যে নিজ ধর্ম ইসলাম প্রেরণ করলেন তখন সাথে সাথে এ আদেশও দিলেন তোমরা সব স্থান মসজিদ বানিয়ে পবিত্র করে নাও।

কথার মাধ্যমে ওহী অবতীর্ণ

পঞ্চমত আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপর যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে এর সবটুকুই নির্ধারিত কথার আকারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এসব কথা না কেবল সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে বরং এদের সংরক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গীকারও করেছেন এবং এ দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। এর

ফলে বিতর্ক ও গবেষণার নীতিতে অনেক বড় পার্থক্য হয়ে গিয়েছে। প্রথমে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতো, এটা মূসা (আ:)-এর কথা না খোদার কথা। কিন্তু মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হের ওয়া সাল্লামকে খোদা তাআলা যে শিক্ষা দান করেছিলেন এর প্রত্যেকটি কথা খোদা তাআলা নিজে অবতীর্ণ করেছেন, বরং এর যের এবং এর যবর পর্যন্ত খোদা তাআলা অবতীর্ণ করেছেন।

আমি একবার স্বপ্নে দেখেছি কোন এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করছে, কুরআন করীমে বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর কারণ কি? আমি তাকে এ জবাব দিলাম, কুরআন মাজীদে কোন পুনরাবৃত্তি নেই। শব্দ তো আলাদা। কুরআন মাজীদে তো যের ও যবরেরও পুনরাবৃত্তি নেই। যে 'যের' এক স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে এর উদ্দেশ্য অন্য স্থানে ব্যবহৃত 'যের' থেকে আলাদা। আবার যে 'যবর' এক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে অন্য স্থানে ব্যবহৃত 'যবর' থেকে এর অর্থ ভিন্ন। এটা কুরআন মাজীদের এমন বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোন ঐশী গ্রন্থের কখনো লাভ হয় নি।

ঐশী গুণাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা

ষষ্ঠত ইসলামী শিক্ষায় ঐশী গুণাবলীর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এর মোকাবেলায় ইহুদীদের শিক্ষা কোন মূল্য রাখে না। এতে কোন সন্দেহ নেই, ইহুদীদের গ্রন্থে ঐশী গুণাবলীর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু এতে ঐশী গুণাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে খুব কমই বর্ণনা করা হয়েছে। একবার আমি অনুসন্ধান করলাম। তখন কুরআন করীমে এমন কোন ঐশী গুণ আমি অবহিত হলাম না, যা ইহুদীদের গ্রন্থে বর্ণিত হয় নি। কিন্তু একটি কথা যা ঐশী গুণাবলীর অধ্যায়ে ইহুদীদের গ্রন্থেও পাওয়া যায় না অথচ কুরআনে পাওয়া যায় এটা এই যে কুরআন এ কথার ওপর আলোচনা করেছে। যেমন, রহমানীয়ত-এর ক্ষেত্র কোন্ স্থান থেকে আরম্ভ হয়েছে? রহীমিয়ত-এর পর্যায় কোন্ স্থান থেকে সূচিত হয়েছে এবং এসব গুণের পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক কী? কিন্তু তওরাত-এর ওপর খুব কমই আলোকপাত করেছে। মোট কথা ঐশী-গুণাবলীর বিভিন্ন বিভাগের যে পারস্পরিক সম্পর্ক– কুরআন করীমে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু তওরাত বিভাগগুলোর উল্লেখ তো করেছে কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্কের উল্লেখ করে নি। এর কারণে ভক্ত এথেকে পুর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। আর এটা এর (অর্থাৎ কুরআনের) শ্রেষ্ঠত্বের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

পুনরুত্থানের মসলার ওপর পরিপূর্ণ আলোকপাত

আবার অতি বিরাট একটি বৈশিষ্ট্য যা কুরআন করীমের লাভ হয়েছে তা হলো এই, এতে পুনরুত্থানের জ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞানভিত্তিক ও দর্শনভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইহুদী সাহিত্যাদি একেবারে নিঃস্ব। এমন কি এতে কিয়ামতের অস্বীকারকারীদের প্রাধান্য ছিলো। আর খুব কম ইহুদীই ছিলো যারা কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস পোষণ করতো। কিন্তু কুরআন করীম সেই প্রথম গ্রন্থ যাতে কিয়ামত ও পুনরুত্থানের মসলা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছে এবং এত বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছে, এখন কেউ যদি জেনেশুনে দুষ্টামি করে কিয়ামতের অস্বীকার করে তো করতে পারে। নচেৎ যুক্তি-প্রমাণের দিক থেকে সে কিয়ামত অবশ্যই অস্বীকার করতে পারে না।

শরীয়তের পরিভাষাসমূহের সৃষ্টি

কুরআন করীমের অষ্টম বৈশিষ্ট্য হলো এই, এতে শরীয়তের পরিষাভাষাসমূহের নতুন দরজা উন্মুক্ত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে এসব লুপ্ত ছিলো অর্থাৎ কুরআন করীমের আবির্ভাবের পূর্বে যেসব কথা রচনাবলীতে ব্যবহৃত হতো কুরআন করীম ওগুলোর জন্যে পরিভাষা সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর এমনসব পরিভাষা সৃষ্টি করেছে যা ইতোপূর্বে ছিলো না। পুনরায় এসব পরিভাষা এমন সুদৃঢ় অর্থ করেছে যাতে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। যেমন, কুরআন করীম 'নবী' শব্দের ব্যবহার করেছে সাথে সাথে এর পরিচয়ও বর্ণনা করে দিয়েছে। আবার বর্ণনা করেছে, নবী কখন আবির্ভূত হন। তাঁকে চেনবার জন্যে কী কী নিদর্শনাবলী হয়ে থাকে। তাঁর কাজ কী হয়ে থাকে। তাঁর সাথে খোদা তাআলার কিরূপ আচরণ হয়ে থাকে। বান্দার সাথে তাঁর কী সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের আরও অজস্র প্রকারের কথা এমন রয়েছে যা কুরআন করীম ছাড়া আর কোন ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণনা করা হয় নি। আর এ এমন একটি শক্তিশালী সৌন্দর্য যা শত্রুও স্বীকার না করে পারে না।

পয়গামী (লাহোরী পার্টি)-দের সাথে আমাদের যখন বিরোধিতা চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিলো সেই দিনগুলোতে একবার বড় বড় পাদ্রী, শিখ জ্ঞানী, হিন্দুদের পন্ডিত আর ইহুদীদের ধর্ম বিশারদদের কাছে পত্র লিখে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাদের ধর্মে নবীর পরিচিতি কী? তখন কোন কোন লোক তো জবাবই দেন নি। কেউ কেউ এ জবাব দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে আমাদের ধর্মে কোন বিশেষ শিক্ষা নেই। সুতরাং এক বড় পাদ্রীর এই জবাব এলো, এ বিষয়ে আমাদের গ্রন্থে বিশেষ কোন আলোকপাত করা হয় নি।

এভাবে ফিরিশ্‌তারা কেমন? তাঁরা কী কাজ করেন? তাঁদের দায়িত্বে কী কী কাজ ন্যস্ত? এসব ব্যাপারে কোন কথা বিস্তারিতভাবে পূর্ববর্তী কোন ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত

হয় নি। কিন্তু ইসলাম যেমন এক দিকে যদিও কোন কোন আধ্যাত্মিক সত্তার জন্যে 'ফিরিশ্‌তা' শব্দ ব্যবহার করেছে তেমনই নিজেই এদের অস্তিত্বের এবং এদের কার্যাবলীর ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অলোকসম্পাত করেছে। এভাবে ঐশী সত্তা, ঐশী গুণাবলী, দোয়া, নিয়তির বিধান, পুনরুত্থান দিবস, বেহেশ্‌ত, দোযখ, বেহেশ্‌তের জীবন প্রভৃতি এসব ব্যাপারেও এ পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করেছে এবং পুনরায় ওগুলোর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে মানুষের মন ও মেধাকে এমনভাবে আলোকোজ্জ্বল করেছে যেন তারা সেসব বিষয় সেই ভাবেই তাদের মন-মস্তিষ্কে জাগরূক রাখতে পারে যেভাবে বস্তুজগতের জ্ঞান ও বিষয়াবলী মনে রাখতে পারে। আর এভাবে জ্ঞান বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে এবং মন-মস্তিষ্ককে অস্থির হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

কুরআনী শিক্ষার ব্যাপকতা

কুরআন করীমের এ নবম বৈশিষ্ট্য লাভ হয়েছে। যদিও ইতোপূর্বে মূসায়ী সিলসিলার রাষ্ট্রনীতি বা ইবাদত এবং কৃষ্টি-সভ্যতা ধর্মীয় পরিমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছিলো অর্থাৎ মূসা (আ:) লোকদের বলেছিলেন, আমার শাসন তোমাদের মানতে হবে তা ধর্মীয় ক্ষেত্রেও, কৃষ্টি সভ্যতার ক্ষেত্রেও, আচার আচরণের ক্ষেত্রেও আর রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও। কিন্তু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে ইসলামের মাধ্যমে একে আরও অধিক প্রবৃদ্ধি দান করা হয়েছে। আর ইসলাম ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা বাদেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও কৃষ্টি-সভ্যতার শিক্ষাও প্রদান করেছে। আচার-আচরণগত, অর্থনৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধীয়, সামাজিকতা ও সভ্যতা সম্পর্কিত বিষয়াবলীও শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করে মানুষের জীবনকে এমনভাবে পরিপূর্ণতা দান করেছে যে, এর কর্মকান্ডের কোন দিকই সঠিক পথ-নির্দেশনা ও পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানের বাইরে থেকে যায় নি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর ধর্ম দাঁড় করানো হয়েছে

কুরআন করীমের শিক্ষার দশম বৈশিষ্ট্য হলো এই। এটা খোদার কথা ও খোদার কাজ একে অপরের জন্যে সহায়তাকারী ও সমান্তরাল নির্ধারণ করেছে যেন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ধর্মকে নিয়ে দন্ডায়মান করে দিয়েছে। যদিও ইতোপূর্বে একে কেবল অধিবিদ্যা বলে নির্ধারণ করা হয়ে থাকতো। যেমন, কুরআন বলেছে পৃথিবী খোদার সৃষ্টি। আর ধর্ম খোদার বাণী। আর খোদার কথা ও কাজে বৈপরিত্য সৃষ্টি হয় এটা অসম্ভব। অতএব যখনই তোমার কোন সংকট উপস্থিত হয় বা যখনই তোমরা কোন সংকটের সম্মুখীন হও তখন তা খোদার কথা ও খোদার কাজ অনুযায়ী নিষ্পন্ন করো। যেখানে এদনুযায়ী কাজ করা হয়

তোমরা বুঝে নাও, এ কাজ সঠিক হয়েছে। আর যেখানে এতে বিরোধ থেকে যায় সেখানে তোমরা মনে করো এখন পর্যন্ত তোমাদের কাছে সঠিক তাৎপর্য উন্মোচিত হয়নি। এ বিষয় নিয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সাথে যে বিরোধ ছিলো তা দূর হয়ে গেছে। কেননা, বিজ্ঞান খোদার কাজ আর ধর্ম খোদার কথা ও বাণী। আর খোদা তাআলার কথা ও কাজে মিল থাকবে না এটা অসম্ভব। আর কোন স্থানে মতবিরোধ যদি পরিলক্ষিতও হয় সেক্ষেত্রে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমরা হয় তাঁর কথা বুঝতে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি নয়তো তাঁর কাজের ওপর দৃষ্টি দিতে আমরা ভুল পথ অবলম্বন করেছি। এ দিয়ে এ বিষয়েরই ত্রুটি অপসারিত করে দেয়া হলে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। অতি সূক্ষ্ম এ তত্ত্বটির কারণে দর্শনের ক্ষেত্র থেকে ধর্ম পৃথক হয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জগতে বিচরণ করছে।

উম্মতের ঐক্যের ভিত্তি

কুরআন করীমের একাদশ বৈশিষ্ট্য হলো এই, এ দাবী করছে এর বাণী যেকোন একটি জাতি বা দুটি জাতির জন্যে নয় বরং সারা দুনিয়ার জন্যে। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, **ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা কাফ্ফাতাল্লিন্নাসি বাশীরঁওয়া নাযীরঁওয়া লাকিন্না আকসারান্নাসি লা ইয়া'লামূন-ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা হাযাল ওআ'দু ইনকুনতুম সদিকীন-কুল্লাকুম মী'আদু ইয়াওমিল্লা তাসতা'খিরূনা 'আনহু সা'আতাঁওয়া লা তাসতাকদিমূন** (অর্থাৎ আমরা তোমাকে বিনা ব্যতিক্রম গোটা মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ লোক তা অবহিত নয়।

আর তারা বলছে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? তুমি বল, তোমাদের জন্যে এক দিনের মেয়াদ নির্ধারিত আছে যা হতে তোমরা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকতে পারবে না আর এক মুহূর্ত সামনেও এগুতে পারবে না (সূরা সাবাঃ ২৯-৩১)।

অর্থাৎ হে রসূল আমরা তোমাকে দুনিয়ার জন্যে বশীর (সুসংবাদদাতা) ও নযীর (সতর্ককারী) করে প্রেরণ করেছি। আর তোমার মাধ্যমে আমরা সারা জগতকে একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে নিয়ে আসবো।

এখন দেখো এ কতই মহাবিপ্লব আর এমনই বিপ্লব এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ইত:পূর্বে প্রত্যেক নবীকে তাঁর নিজ নিজ জাতির প্রতি আরোপিত করে প্রেরণ করা হয়ে থাকতো। আর যে শিক্ষা তাঁরা নিয়ে আসতেন তা তাঁদের জাতির জন্যেই নিয়ে আসতেন। যেমন, হিন্দুস্থানে যদি শ্রীকৃষ্ণ শাসন করে

থাকতেন তাহলে ইরানে যরথুস্ত্র শাসন করতেন এবং চীনে কনফুসিয়স শাসন করতেন। এভাবে মূসারও কোন উম্মত থাকলে ঈসারও ছিলো। কিন্তু খোদা বল্লেন, এখন দুনিয়াতে একটিই ধর্মীয় অনুশাসন থাকবে আর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সারা দুনিয়াকে একটি পতাকার ছায়াতলেই নিয়ে আসা হবে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও স্বয়ং নিজের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, *কানান্নাবিয়্যু ইউআসু ইলা কওমিহী খায়াস্সাতান ওয়া বুসিসতু ইলান্নাসি 'আম্মাতান* অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী নিজ নিজ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি ভূপৃষ্ঠের গোটা মানবজাতির জন্যে প্রেরিত হয়েছি।

এ বিপ্লব যেহেতু একটি নব বিপ্লব ছিলো আর লোকেরা এটা প্রথম বারের মতো শুনতে পেলো যে, বিশ্ব আধ্যাত্মিকভাবে একটি সত্তায় পরিণত হবে। এজন্যে তারা বিস্মিত হয়ে গেলো। আর যেভাবে তিনি (স:) একত্ববাদের শিক্ষা উপস্থাপন করেছিলেন এবং কাফিররা ঘাবড়ে গিয়েছিলো, সেভাবেই এ দাবীর সময়েও হয়েছিলো। যেমন একত্ববাদ বা তৌহীদের দাবী প্রসঙ্গে কুরআন করীমে এসেছে, কাফিররা এর সম্বন্ধে শুনে বলে উঠেছে– **আজা'আলাল আলিহাতা ইলাহাঁওয়াহেদান** [অর্থাৎ কী, সে বহু মা'বূদ (উপাস্য)-কে এক মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? (সূরা বা'দঃ ৬]।

অর্থাৎ বিশ্বে আগে থেকেই অনেক খোদা মজুদ আছে, সে কি সবাকে একত্র করে একজন খোদা বানাতে চায়? অর্থাৎ কেউ ইরানীদের খোদা– যেভাবে তারা আহরমান বা ইয়াযদান বলে থাকে। কেউ খ্রিষ্টানদের খোদা-যেভাবে তারা গড বা খোদাওয়ান্দে ঈসু মসীহ বলে থাকে। কেউ হিন্দুদের খোদা-যেভাবে তারা পরমেশ্বর বা ওঁ প্রভৃতি বলে থাকে। কেউ ইহুদীদের খোদা- যেভাবে তারা যীহুদা বলে থাকে। মোটকথা, এরূপ বিভিন্ন খোদা রয়েছে, দুনিয়াতে যাদের নাম মজুদ আছে। কিন্তু এখন সে কিনা বলে যে, কেবল এক খোদাকে মান্য করো তাহলে সে কি সব খোদাকে একত্র করে এক খোদা বানিয়ে দেবে? এতো বুদ্ধি-বিরুদ্ধ কথা যে, এতগুলো খোদাকে কাটছাট করে এক খোদা বানিয়ে দেয়া হয়।

মোটকথা কাফিররা চিন্তিত হলো। আর তারা বিস্ময় প্রকাশ করলো। কিন্তু এখন দেখ ইয়াযদান, গড, ওঁ, যীহুদা প্রভৃতি সবার নাম আল্লাহ্‌র মাঝে আত্মস্থ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্‌র নামই সব নামের ওপর পরাভব হয়েছে। আর আজ সারা দুনিয়া একত্ববাদের ধারণার যথার্থতা স্বীকার করছে। একত্ববাদের দাবীর পরে শত্রুরা যেভাবে বিস্মিত হচ্ছিলো সেভাবেই তাঁর (স:) এ দাবীতেও তারা বিস্মিত হয়েছে– **ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা কাফ্‌ফাতাল্লিন্নাসি বাশীরাঁওয়া নাযীরা**–আমরা তোমাকে সারা জগতের জন্যে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যেমন কুরআন করীমে সে সম্বন্ধে এসেছে– **ওয়ালাকিন্না আকসারান্নাসি লা ইয়া'লামূন**। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ রহস্যকে বুঝতে পারে নি।

আমি বুঝি, সেই যুগে লোকদের জন্যে এ রহস্য উপলব্ধি করা এমনই কঠিন ছিলো যেভাবে আদমের যুগে লোকদের জন্যে এটা উপলব্ধি করা কঠিন ছিলো যে,

আমাদের মতো আর এক ব্যক্তি আমাদের ব্যাপারে কথা বলার অধিকার রাখে। মক্কার কাফিররা এ দাবীর ওপর ভীষণ আশ্চর্যান্বিত হতো আর বলতো কেমন অদ্ভুত কথা এ ব্যক্তি [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স:)] জন্ম নিলো আরবে আর বলে কিনা সে নাকি ইরানেরও নবী, আর চীনেরও নবী তাই তারা তাদের এ বিস্ময় প্রকাশ করতো আর বলতো– **মাতা হাযাল ওআ'দু ইনকুনতুম সদেকীন** তুমি নিজের এ কথায় যদি সত্যবাদী হও, সারা দুনিয়া একই পতাকার তলে সমবেত হবে– তাহলে এ কখন পূর্ণ হবে? আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন– **কুল্লাকুম মি'আদুন ইয়াওমিন** (অর্থ: তুমি বলে দাও, তোমাদের জন্যে একদিনের মেয়াদ নির্ধারিত আছে (সূরা সাবা: ৩১)। তুমি সেসব লোকদের বলে দাও, মনে করো সেই যুগ আসাতে এতটা বিলম্ব যতটা সূরা সিজদাহ-এর মাঝে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা এই, **ইউদাব্বিরুল আমরা মিনাস সামায়ি ইলাল আরযি সুম্মা ইয়া'রুজু ইলায়হে ফি ইয়াওমিন কানা মিকদারুহূ আলফা সানাতিম্মিম্মা তা'উদ্দুন** (অর্থ: তিনি আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে আদেশ প্রবর্তন করেন। এরপর এ তাঁর দিকে উঠে যাবে একদিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর (সূরা আস সাজদা: ৬)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের বিষয়াদি প্রথমে তো পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরপর এক হাজার বছর সময়ে এ আকাশে উঠে যাবে।

এ আয়াতে ইসলামের প্রথম প্রকাশের যুগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যার মাঝ থেকে এক হাজার বছরের সময়সীমা তো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম দিকের সময় নির্ধারণ করে দেন নি। কিন্তু একে রসূলে করীম (স:)-এর হাদীস নির্ধারণ করে দিয়েছে। কেননা, তিনি (স:) বলেন, *খায়রুল কুরূনি কারনী সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালূনাহুম, সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালূনাহুম সুম্মাল ফায়জুল আওয়াজু* অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর শতাব্দী হলো আমার। অত:পর এর পরের শতাব্দী, পুনরায় এর পরের শতাব্দী এরপর ধ্বংস।

আদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যুগ

উপরোক্ত হাদীস পাঠে অবগত হওয়া যায়, আদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যুগ হলো তিন শতাব্দী এবং এরপর ধ্বংসের যুগ হলো এক হাজার বছর। আর এরপর পুনরায় উন্নতির যুগ। মোটকথা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তেরশ বছর পরে ইসলামের দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার সময় নির্ধারিত বলে– বলে গিয়েছিলেন।

অতএব এস্থলে যে **কুল্লাকুম মি'আদু ইয়াওমিন** বলেছেন এথেকে সেই দিনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার উল্লেখ সূরা আস সিজদাতে করা হয়েছে। আর সেই হাজার বছর হলো ইসলামের অধঃপতনের যুগ। এর পরে বলা হয়েছে, পুনরায় ইসলাম উন্নতি করবে এবং সব জাতির মাঝে বিস্তার লাভ করবে। কেননা, সেই যুগ হবে ইসলামের পূর্ণ প্রচারের যুগ। **হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহূ বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহী** (অর্থঃ তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন (সূরা সাফ্ফঃ ১০) আয়াতও এদিকে ইঙ্গিত করে।

নির্ধারিত এক দিনের মেয়াদ অর্থ

অতএব এস্থলে নির্ধারিত এক দিনের মেয়াদ বলতে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের যুগের পূর্বে ইসলামের হাজার বছরের অধঃপতনের দীর্ঘ যুগের প্রতি ইঙ্গিত বুঝায় যার পরে ইসলামের দ্বিতীয় বার উন্নতির যুগ নির্ধারিত করা হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পরিমন্ডল

কোন কোন খ্রিষ্টান এ উপলক্ষ্যে বলে থাকে, এ শিক্ষা তোমাদের জন্যে নতুন নয়। আমাদের ধর্মেরও এই শিক্ষা। তোমরা তোমাদের বাণীকে সারা জগতে পৌছে দাও। আর আমাদের মসীহ্ও কোন এক জাতির জন্যে আবির্ভূত হননি বরং সারা জগতের জন্যে এসেছিলেন।

আমি আমার একটি পুরানো প্রবন্ধে খ্রিষ্টানদের এ দাবীর জবাব দিয়েছি। আর ইঞ্জিলসমূহের বহু উদ্ধৃতি পেশ করেছিলাম যে, হযরত মসীহ্ নাসেরী সারা বিশ্বের জন্যে আবির্ভূত হননি বরং কেবল বনী ইসরাঈলের জন্যে এসেছিলেন। আর তিনি নিজ ইঞ্জীলে বলেন, 'তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল কূলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই' (মথি- ১৫:২৫)।

আর তার হাওয়ারী (শীষ্য)-গণেরও ব্যবহারিক রীতিনীতি এটাই ছিলো। কিন্তু আজ আমি অন্য আর এক ভঙ্গীতে খ্রিষ্টানদের দাবী নাকচ প্রমাণ করছি। আর তা হলো এই, খোদা যদি এ কথা বলতেন, মসীহ্ সারা জগতের জন্যে আবির্ভূত হয়েছে এবং তার মাধ্যমে সব মানুষ একটি পতাকার নিচে সমবেত হবে, তাহলে বস্তুত খোদা যা বলেন তা অবশ্যই পূর্ণ হওয়া উচিত। আর যেহেতু এটা ছিলো বিপ্লবাত্মক শিক্ষা এবং আর এজন্যে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো যেন সারা জগৎ

একাকার করে দেয়া যায় এবং জাতীয়তাবাদ দুর্বল করে দেয়া যায়। এজন্যে আমাদের দেখা উচিত, এ উদ্দেশ্য কি মসীহীয়্যত বা খ্রিষ্টবাদ পূর্ণ করে দিয়েছে?

খ্রিষ্টবাদ নি:সন্দেহে ইউরোপেও বিস্তার লাভ করেছে, চীনেও বিস্তার লাভ করেছে, জাপানেও বিস্তার লাভ করেছে আর হিন্দুস্তানেও বিস্তার লাভ করেছে। আর এমন এমন স্থানে পৌছেছে যেখানে বোধ করি মুসলমানগণও পৌছুতে পারেনি। কিন্তু প্রশ্ন এই, সেই শিক্ষার যে উদ্দেশ্য ছিলো তা কি পূর্ণ হয়ে গেছে? সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য তো এই ছিলো যে, বিভক্তির ধারণাকে মিটিয়ে দেয়া হোক। জাতীয়তাবাদ দুর্বল করে দেয়া হোক। আর গোটা দুনিয়াকে সাম্যের পতাকাতলে সমবেত করা হোক। এখন যদি খোদা মসীহকে বলে থাকেন, তোমার মাধ্যমে বিশ্বের জাতিগুলোর ভেদাভেদ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং সারা জগৎ একাকার হয়ে যাবে তাহলে খ্রিষ্টবাদের মাধ্যমে এ বিপ্লব সাধিত হওয়া উচিত ছিলো। আর মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে যদি খোদা এ কথা বলতেন, তোমার মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহের বিভক্তি ও ভেদাভেদ মিটে যাবে এবং গোটা দুনিয়া একই পতাকার তলে সমবেত হবে তাহলে ইসলামের মাধ্যমে এ বিপ্লব সাধিত হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, খ্রিষ্টবাদ থেকে অধিক জাতীয়তাবাদ ও স্বজাতি পূজার শিক্ষা অন্য আর কেউ দেয় নি। আর বিশ্বে তোমরা একটি দেশও এমন দেখাতে পারবে না যেখানে খ্রিষ্টবাদ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। কিন্তু বিশ্বে তোমরা একটি দেশও এমন দেখাতে পারবে না যেখানে ইসলাম পৌঁছেছে কিন্তু সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আজ ইংরেজ জার্মানের শত্রু আর জার্মান ইংরেজের শত্রু। আর তারা উভয়েই একে অপরের গলা কাটার জন্যে প্রস্তুত থাকে। একে অপরকে ধ্বংস করার জন্যে বিমান নির্মাণ করে। ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন করে এবং আধুনিক থেকে আধুনিকতর ও দূর দূর পর্যন্ত ক্ষেপণযোগ্য বোমা তৈরী করে। কিন্তু যে একজন হিন্দুস্তানী খ্রিষ্টানের সাথে একজন ইংরেজ সেই সম্পর্ক কখনো সৃষ্টি করবে না যা একজন জার্মান নাস্তিকের সাথে করে নেবে। খোদা তাআলা যদি তাদের সারা দুনিয়ার জন্যেই প্রেরণ করে থাকতেন তাহলে এর ফলাফল তারা কেন এটা দেখাতে পারে না যা আসলে দেখানো উচিত ছিলো? অন্যদের কথা না হয় বাদই দিলাম ইউরোপীয় খ্রিষ্টানগণ তো তাদের সাথেও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে না যারা তাদের খোদাওন্দের ভাই। যেমন দেখ! জার্মানীতে ও অন্যান্য দেশগুলোতে ইহুদীদের ওপর কতই নির্যাতন চালানো হচ্ছে! আসলে তারা কারা? তারা তো তাদের খোদাওন্দের (অর্থাৎ যীশু খ্রিষ্টের) সমগোত্রীয় ভাই। কিন্তু তারা তাদের সাথেও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত নয়।

এর তুলনায় রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এতটা সাম্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, একজন মূর্খ আরব, একজন গরীব আরব, একজন ডাকাত আরব দুনিয়ার যে কোন স্থানে থাক না কেন মুসলমানদের কাছে এমন আনন্দ অনুভূত হয় যেন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি জীবিত হয়ে দুনিয়াতে ফিরে এসেছেন। আর 'আরবী সাহেব' 'আরবী সাহেব' বলতে বলতে তাদের মুখে ফেনা উঠে যায়।

অতএব খ্রিষ্টানদের সেই দাবী স্বয়ং খোদার কাজ মিথ্যে প্রমাণিত করছে। আর তাদের কাজ এটা বলে দিচ্ছে, এ বিপ্লব মুহাম্মদী বিপ্লব। আর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্যে করেই সেই শিক্ষা অবতীর্ণ করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ:)-এর ওপর এ শিক্ষা যদি অবতীর্ণ করা হতো তাহলে খোদা তাআলা তাদের মাধ্যমে এ কাজও করিয়ে নিতেন। অবশ্য এটা ঠিক, যদিও আসল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার পূর্বে শুভ সংবাদের বায়ু প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। এজন্যে খ্রিষ্টানদের যুগে যখন মুহাম্মদী বিপ্লবের শুভ সংবাদ এলো আর হযরত ঈসা আলায়হেস সালামকে আল্লাহ্ তাআলা বল্লেন, এক মহান নবীর মাধ্যমে, যিনি সব নবীর নেতা হবে, সারা বিশ্ব একীভূত হবে এবং সারা জগৎ একই পতাকার নিচে সমবেত হবে, তখন খ্রিষ্টানগণ এতে ধোঁকায় পতিত হলো। আর তারা মনে করলো, এখন থেকেই এর সময় শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু চুরি করা পোশাক কিভাবে মানানসই হতে পারতো। খোদার কর্ম প্রমাণ করে দিলো, এ কথা খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে বলা হয় নি বরং মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিলো।

ইসলামী বিপ্লব

মোটকথা এসব উত্থান-পতনের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বের জ্ঞান, এর চেষ্টা-সাধনা, এর দর্শন, এর আবেগ, এর ধর্ম, এর রাষ্ট্রনীতি, এর স্বভাব চরিত্র, এর কৃষ্টি, এর সামাজিকতা, এর অর্থনীতি আর এর সভ্যতা সর্বৈব পরিবর্তন করে দিলো। আর বিশ্ব ওলটপালট হয়ে গেলো। আর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একটি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে দিলেন।

ইসলাম ও অন্য ধর্মের মাঝে সাদৃশ্যের আসল কারণ

আজ ইসলাম ও সেসব ধর্মে যে সাদৃশ্য দৃশ্যমান হয় তা এ কারণে নয়, এ সাদৃশ্যের বিষয়াবলী সেসব ধর্মে প্রথম থেকেই বিরাজমান ছিলো, বরং এ কারণে হয়েছে ইসলামের সাথে মিলে-মিশে তারা এর কোন কোন শিক্ষা নিজেদের করে

নিয়েছে। যদিও ধর্ম তো পৃথকই থাকলো, কিন্তু ইউরোপের লোকেরা মুসলমানদের বই-এর পর বই নকল করেছে। আর সেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তাদের প্রতি আরোপ করে নিয়েছে। যেমন ইউরোপে আজকাল এমন কোন কোন পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে যাতে এ রকমের চুরি ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে আমি ইংল্যান্ড থেকে একখানা বই আনিয়েছি। এত সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে বিতর্ক করা হয়েছে এবং প্রমাণ করা হয়েছে যে ইউরোপের লোকেরা স্পেনের মুসলমানদের পুস্তক থেকে এ জ্ঞান নকল করেছে বরং লেখক এ তথ্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন যে, আমি এসব পুস্তকের উদ্ধৃতি দিতে পারি যেসব পুস্তক থেকে ইউরোপের লোকেরা এসব বিষয় নকল করেছে। আরও বলেছেন, এ মূর্খতা দেখ, বৃটিশ মিউজিয়ামে (যাদুঘর) অমুক নম্বরে অমুক পুস্তক রয়েছে। এতে অমুক পাদ্রীর নামে একটি পত্রের কথা বলা হয়েছে যা কোন একজন খ্রিষ্টান তাকে লিখেছিল এই বলে যে, পাদ্রী সাহেব, মুসলমানরা সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী আর সে তুলনায় আমাদের সঙ্গীত বিদ্যা খুব বিশ্রী মনে হয়। আমি চাচ্ছি, তাদের বিদ্যা ইউরোপের লোকদের জন্যে অনুবাদ করে দিই। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি মুসলমানদের জ্ঞান নকল করলে পাদ্রীদের পক্ষ থেকে না আবার আমার ওপর কুফরীর ফতোয়া লেগে যায়। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি? এ জ্ঞান যদি নকল করে নেয়া যায় তাহলে এথেকে গীর্জার খুব উপকার হবে। বিশপ সাহেব এর জবাব এই দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই জ্ঞান নিজেদের পুস্তকে নকল করে নাও। কিন্তু একটি কথার প্রতি দৃষ্টি রাখবে আর তা এই, তোমরা যদি নিচে উদ্ধৃতি দাও তাহলে লোকেরা জেনে যাবে এ জ্ঞান আরবদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে আর এভাবে আমাদের ধর্মের অনুসারীদের অন্তরেও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অতএব তুমি নিঃসন্দেহে নকল করো কিন্তু উদ্ধৃতি দিবে না, যেন লোকেরা মনে করে, এ জ্ঞানের কথা তুমি নিজের থেকে বর্ণনা করছো। সুতরাং সে লিখছে, সেই পত্র আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

এভাবে প্যারিস শহরে ১৯৪০ সন পর্যন্ত ইবনে রুশদের দর্শন পড়ানো হতো। কিন্তু নামে কিছুটা পরিবর্তন করে দেয়া হতো যেন লোকেরা এটা জেনে না ফেলে যে, এটা মুসলমানের দর্শন। মজার গল্প আছে এই বলে যে, রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, ভবিষ্যতে দর্শনের এই পুস্তক যেন না পড়ানো হয়। বরং অমুক বই যেন পড়ানো হয়। কেননা, এখন দর্শন অনেক উন্নতি লাভ করেছে। তখন পাদ্রীরা কুফরীর ফতোয়া দিয়ে দিলো এবং বল্লো, এটা অধার্মিকতার কাজ। সুতরাং এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও তাদের এটা মনে থাকলো না, এটা একজন মুসলমানের রচিত পুস্তক। বরং

তারা এটা মনে করতে লাগলো এটা কোন খ্রিষ্টানের পুস্তক। আর এর স্থলে যদি এখন আর কোন দর্শনের পুস্তক পড়ানো হয় তাহলে এটা কাফিরের কাজ বলে গণ্য হবে।

আমাদের লোকেরা অজ্ঞাত কারণে সাধারণভাবে একথা বলে থাকে, এ কথাও খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে ধার করা হয়েছে আর সে কথাও। যদিও মুসলমানগণ জাতি হিসেবে খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে কোন কথা ধার করে নি। কিন্তু খ্রিষ্টানগণ মুসলমানদের কাছ থেকে জাতীয় সত্তার ভিত্তিতে জ্ঞান ধার করেছে। কিন্তু যেহেতু মুসলমানগণ এখন সেসব জ্ঞান বিস্মৃত হয়ে বসেছে এবং খ্রিষ্টানরা স্মরণ রেখেছে বরং তাদের মাঝে যুগের উন্নতির সাথে সাথে উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং এর আকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। এ জন্যে মুসলমানগণ (তাদের নিজেদের জিনিস) চিনতে পারছে না আর এখন তো অমনোযোগিতার এ যুগ যে, মুসলমানদের না ধর্ম অবশিষ্ট আছে না সচ্চরিত্র, না কৃষ্টি অবশিষ্ট আছে আর না রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, না সভ্যতা অবশিষ্ট আছে না ভদ্রতা। অতএব পাশ্চাত্যই অবশিষ্ট আছে যা তাদের আচ্ছাদিত করে রেখেছে। যদিও এসব কথা কুরআন মাজীদে মজুদ আছে। এতে প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ উন্নতি সাধন করেছিলো এবং এ দিয়ে বর্তমান কালের মুসলমানগণ উন্নতি সাধন করতে পারে। কিন্তু তারা তো কুরআন (গিলাফে) আচ্ছাদন করে রেখে গিয়েছে এবং পাশ্চাত্যের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, যেভাবে পাখীর ছানা বসে বসে মায়ের আসার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাদের দৃষ্টান্ত অবিকল এমনই যেভাবে বলা হয়, ইরানের বাদশাহ একবার হিন্দুস্তানের আমের প্রশংসা শুনলেন। তার মনে আম খাবার সাধ জাগলো। বাদশাহ হিন্দুস্তানে তাঁর দূত পাঠালেন যেন আম নিয়ে আসা হয়। সে যখন এখানে পৌছলো তখন আমের মৌসুম শেষ। কিন্তু বাদশাহ এটা মনে করে যে, ইনি ইরানের বাদশাহের দূত এবং বহুদূর থেকে এসেছেন, তাই তিনি দিল্লী ও এর আশেপাশে জোরেশোরে অন্বেষণ করালেন। পরিশেষে বহু খোঁজাখুঁজি ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর একটি বারো মাসি আম পাওয়া গেল। কিন্তু এ ছিলো খুবই টক এবং আঁশযুক্ত। বাদশাহ সেই দূতকে ডেকে বললেন, আমের আকৃতি আপনি দেখে নিন। আমের আকৃতি এরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাদ যদিও খুব মিষ্টি হয় কিন্তু এই যে আম পাওয়া গেছে এটা সেরকম ভাল নয়। কিন্তু যেহেতু আপনাকে এখন ফিরে যেতে হবে তাই এর একটু স্বাদ গ্রহণ করে যান, যেন আপনি বাদশাহের সমীপে আমের তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারেন। তিনি স্বাদ নিয়ে দেখলেন, এ খুব টক ও বিস্বাদ। তিনি যখন ফিরে গেলেন এবং ইরানের শাহ তাকে আম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন তখন বল্লেন, আমার হিন্দুস্তানীদের আকল-

বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। তিনি বললেন, কেন? তিনি বললেন, তারা আমের বড়ই প্রশংসা করে আর আপনিও আমাকে আমের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু আমি যে আমের স্বাদ গ্রহণ করে এসেছি এর বিবরণ আপনি এ জিনিস থেকে অনুমান করতে পারেন। একথা বলে তিনি একটি পেয়ালা উপস্থাপন করলেন যাতে তেতুলের আঁশ ও কিছু পানি ছিলো। বাদশাহ এ দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। আর তিনি বল্লেন, হিন্দুস্তানীরা এমন বাজে জিনিসের এত প্রশংসা করে থাকে?

আজকাল মুসলমানদের অবস্থাও এটাই। তারা কুরআন করীমের জ্ঞান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেছে; বরং কুরআন করীম তাদের কাছে একটি মৃত পুস্তকে পরিণত হয়েছে। আর এখন তাদের সামনে যা-ই রয়েছে একে এবং কুরআন করীমকে অবলীলায় তারা একই মর্যাদা দিয়ে থাকে। তারা উন্নত মানের ও স্বাদযুক্ত আমকে পানিতে সিক্ত তেতুল মনে করে। যদিও সব রকম সৌন্দর্য ইসলামে রয়েছে। সব রকম কল্যাণ ইসলামে রয়েছে। আর ইউরোপ মৌলিক জ্ঞানের যা-ই শিখেছে, ইসলাম ও মুসলমানদের কাছে থেকে ধার করে শিখেছে। কিন্তু মুসলমানরা যেহেতু এটা অবহিত নয় তাই তারা পাশ্চাত্যের প্রেমিক বনে গেছে।

পাশ্চাত্যের নীতি

মোটকথা বর্তমান কালে ইসলামের শিক্ষার গোটা অংশ কোথাও পাওয়া যায় না কেবল টুকরো টুকরো অংশ পাওয়া যায়। আর আসল ইসলামী শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানগণ ভুলে বসে আছেন। পাশ্চাত্য তাদের ওপর জয়লাভ করেছে। তাদের মূলনীতিগুলো হচ্ছে: (১) বস্তুবাদ (২) এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হচ্ছে জাতীয়তাবাদ (৩) আর ধর্মীয় ও আদর্শগত বিষয়াদি জাতীয়তাবাদের দাসে পরিণত করা।

এসব বিষয় চারিত্রিক, ধর্মীয় ও প্রকৃত কুরবানী এবং বিশ্বশান্তিকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর ধর্মের চেহারা বিকৃত করে দিয়েছে। এখন যদি ইউরোপের লোকেরা কোন জিনিষের নাম ধর্ম রাখে তাহলে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, সেই ধর্ম তাদের শাসন কতটা শক্তিশালী করে। এক হিন্দুস্তানী মস্তিষ্ক এ কথা বুঝতেও পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ঘটছে, জার্মানীতে বিদ্রোহ হলে পাদ্রী যখন দেখে যে, খ্রিষ্টবাদের শিক্ষা তাদের এতটা শক্তিশালী করে না যে, বিদ্রোহকে নস্যাৎ করে, তখন বড়ই আয়াশের সাথে তারা ধর্মীয় পুস্তকের অনুশাসনাদির পরিবর্তন করে একটি নতুন দর্শন তৈরী করে। আর ছোট বড়

সবাই এক বাক্যে বলে ওঠে, আমাদের ধর্মতো এটাই। একজন মুসলমান এ কথা বুঝতেও পারে না যে, এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এটা সে রকম কথাই যেভাবে কাউকে একশ বিয়ে করতে হয় আর সে দেখে কুরআন মাজীদে এর অনুমতি নেই। তাই অনায়াসে দুটি তিনটি সম্বলিত আয়াতের স্থলে একশ মহিলাকে বিয়ে করা সম্বলিত কথা লিখে দেয় আর বলে আমি আমার ধর্মীয় গ্রন্থের শিক্ষানুযায়ী একশ বিয়ে করেছি। প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে বলবে, তুমি নিজ হাতে একটি কথা লিখে নিয়েছো। এটা তোমার ধারণায় সঠিক বলে মনে হতে পারে কিন্তু একে ধর্মীয় অনুমোদন কিভাবে বলতে পারো? সুতরাং ইউরোপ-বাসীদের অবস্থা এমনই। তারা যখন দেখতে পারে ধর্মীয় কোন শিক্ষার ওপর আমল করার ফলে তাদের জাতীয় দিক থেকে ক্ষতি সাধিত হতে পারে তখন সত্বর তারা এ শিক্ষার পরিবর্তন করে দেয়। আর নতুন এক দর্শনের উদ্ভাবন করে এর নাম ধর্ম রেখে দেয়, যেন ধর্মের সাথে এতই দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে যে তারা জাতীয়তাবাদকেই ধর্ম মনে করছে। তারা বলে, যে বস্তু জাতীয়তাবাদকে শক্তি দান করে থাকে সেটাই খোদার ইচ্ছা। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে, নৈতিকতা হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে আর ধর্মও বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং জাতীয়তাবাদের ওপর ধর্মের ভিত্তি রেখে সত্যিকারের কুরবানীর আত্মাকে বিনাশ করে দেয়া হয়েছে। এখন একজন জার্মান এজন্যে কুরবানী করবে না যে, এতে মানব-সন্তানের কী কল্যাণ হচ্ছে বরং এজন্যে কুরবানী করবে যে, জার্মান জাতির এতে কী কল্যাণ লাভ হবে বা একজন ইংরেজ এজন্যে কুরবানী করবে না যে, তাদের কুরবানীর প্রয়োজন আছে বিশ্বের বরং সেই সময়ে কুরবানী করবে যখন তার জাতির প্রয়োজন তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেবে।

সপ্তম পর্যায়ের বিপ্লব হলো মুস্তাফা (স:)-এর শিক্ষার পুনর্জীবন

মোটকথা বস্তুবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সব ধর্ম ও চারিত্রিক বিষয়াদি জাতীয়তাবাদের অধীন করার প্রবণতা বিশ্ব-শান্তিকে সর্বৈব বিনাশ করে দিয়েছে। এ জন্যে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামকে বর্তমান যুগে ঐশী সভ্যতার সপ্তম পর্যায়ে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁর দায়িত্বে এ কাজ ন্যস্ত করেছেন যেন তিনি সেই দ্বিতীয় প্রকারের বিপ্লব সৃষ্টি করেন। যেভাবে আয়াত **মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনাসিহা না'তি বিখইরিম্মিনহা আও মিসলিহা** এর শেষ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কখনো এভাবেও বিপ্লব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে যে, ঐশী গ্রন্থ তা-ই কার্যকরী হিসেব থাকে, যা পূর্ব থেকেই

মজুদ থাকে। কিন্তু খোদা তাআলা দ্বিতীয় বার এর মৃত শিক্ষাকে জীবিত করার জন্যে এক ব্যক্তিকে নিজ পক্ষ থেকে দাঁড় করিয়ে দেন যিনি লোকদের পুনরায় সেই শিক্ষার ওপর নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। আর এ দিকে সূরা জুমুআয়ও এ ভাষায় ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

হুয়াল্লাযী বা'আসা ফিল উম্মিঈনা রসূলাম্মিনহুম ইয়াতলূ আলায়হিম আয়াতিহী ওয়া ইউযাক্কীহিম ওয়া ইউ 'আল্লিমুহুমূল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা - ওয়া ইন কানূ মিন ক্বলু লাফী যলালিম্মুবীন - ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূ বিহিম - ওয়া হুয়াল 'আযীযুল হাকীম। [অর্থঃ তিনিই উম্মীদের মাঝে তাদেরই মাঝ থেকে একজন রসূল আবির্ভূত করেছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করে, আর তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও ইতঃপূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিলো এবং (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মাঝ থেকে অন্য লোকের মাঝেও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় (সূরা জুমুআ, আয়াত ৩-৪)]

অর্থাৎ খোদাই উম্মীদের মাঝ থেকে তাঁর রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে ঐশী আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন আর তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও ইত:পূর্বে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিলো। আর সেই খোদাই মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন এবং পুনরায় তাঁর মাধ্যমে এমন একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করবেন যা সাহাবাদের রঙ্গে কিতাবের জ্ঞানে জ্ঞানী হবে, পবিত্র আত্মার অধিকারী এবং জ্ঞান ও হেকমত সম্বন্ধে অবহিত হবে যেন সেই কাজই করবে যা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম করেছেন। নতুনভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামকে করতে হবে।

দ্বিতীয় আবির্ভাবকালীন কাজ

সূরা সাফ্ফের মাঝেও সপ্তম পর্যায়ের কাজ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহূ বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহূ আলাদ্দীনি কুল্লিহি - ওয়া লাও কারিহাল মুশরিকূন**। [অর্থঃ তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন, মুশরিকরা যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন (সূরা সাফ্ফ: ১০)]।

অর্থাৎ একদিন এমন আসবে আল্লাহ্ তাআলা নিজ রসূল (স:) কর্তৃক আনীত বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবেন এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর বিজয়ী করে দিবেন।

স্বয়ং মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর ওপরও এ আয়াত ইলহাম হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে যেন এটা বলা যায়, যে যুগে এটা সংঘটিত হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছিলো তা এসে গেছে। প্রাচীন তফসীরকারগণও এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে এ আয়াত শেষ যুগের প্রসঙ্গে এবং এ কাজ মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর যুগেই সংঘটিতব্য।

মোটকথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, প্রথম আবির্ভাবের সময় তো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিলো আর দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয়ের কাজ নির্ধারিত রয়েছে অর্থাৎ (১) যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এসব ধর্মের অনুসারীদের ইসলামে প্রবেশ করানো এবং (২) তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মিটিয়ে দিয়ে এর স্থলে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া। এ জন্যে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমরা মসীহ্ মাওউদ (আ:)-কে কেবল এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি– **লিইউযহিরাহূ আলাদ্দীনি কুল্লিহী–** যেন সারা বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করে দিই।

ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমসমূহ

এখন দেখা উচিত, সব ধর্মের ওপর ইসলামের সার্বিক বিজয় কিভাবে হতে পারে? কেবল শিক্ষার বিষয়টা যদি নেয়া হয় এবং এ ধারণা করা হয়, প্রত্যেক ধর্মের কোন কোন ব্যক্তি আমরা আমাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেব তাহলে এটা তাদের ধর্মের ওপর বিজয় বলা যেতে পারে না। কেননা, বাতিলকৃত ধর্মগুলোর অস্তিত্বও সেক্ষেত্রে থেকে যাবে এবং তারা ইসলাম থেকে পৃথক থাকবে। তাদের ওপর ইসলামের কোন বিজয় সংঘটিত হবে না। সুতরাং অবশ্যই এটা মানতে হয়, বিজয়ের অর্থ এ নয়, বরং বিজয়ের অর্থ এই, আজ ধর্মীয় কোন্দল থাকা সত্ত্বেও যেভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা দুনিয়াতে বিজয় লাভ করেছে এভাবে আমাদের কাজ এই, আমরা ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতাকে এমনভাবে জারী ও প্রচলন করবো যেন লোকেরা খ্রিষ্টান হওয়া সত্ত্বেও তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হবে ইসলামী। লোকেরা ইহুদী হবে কিন্তু তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হবে

ইসলামী। লোকেরা ধর্মীয়ভাবে হিন্দু হবে কিন্তু তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হবে ইসলামী। এ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামকে আবির্ভূত করেছেন, যেন ইসলামী সভ্যতাকে এতখানি প্রচলন করা হয়, এতখানি প্রচলন করা হয়, দুনিয়ার কিছু অংশ যদি ইসলামের বাইরেও থেকে যায় তবুও যেন ইসলামী সভ্যতা তাদের ঘরে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। আর তারা সেই সংস্কৃতিই গ্রহণ করে যা হবে ইসলামী সংস্কৃতি। মোটকথা যেভাবে আজকাল লোকেরা বলে, পাশ্চাত্য সভ্যতা উৎকৃষ্ট। এভাবে দুনিয়াতে এমন এক বায়ু প্রবাহিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বলতে থাকে, ইসলামী সভ্যতাই সবচেয়ে উত্তম।

প্রকৃত বিপ্লব প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর ইলহামসমূহ

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের ইলহামসমূহকে যদি দেখা যায় তাহলে ওগুলোর মাঝে সেই দাবী পাওয়া যায়। যেমন–

(১) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর একটি কাশ্ফ (দিব্য-দর্শন) যাতে তিনি দেখেছেন যেন তিনি বলছেন– 'আমরা একটি নতুন ব্যবস্থাপনা এবং একটি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী চাচ্ছি' (তাযকেরা, পৃষ্ঠা ১৯৪)।

চশমাহ্ মসীহী পুস্তকে তিনি এ কাশ্ফ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'এ কাশ্ফের উদ্দেশ্য ছিল, খোদা আমার হাতে এমন এক পরিবর্তন আনবেন যেন আকাশ ও পৃথিবী নতুন হয়ে যায় এবং সত্যিকারের মানুষ সৃষ্টি হয়' (চশমাহ্ মসীহী, পৃষ্ঠা ৩৫, পাদটীকা)।

(২) আবার ইলহাম রয়েছে, 'ইউহিদ্দীনা ওয়া ইউকীমুশ্শারী'আতা' (তাযকেরা, পৃষ্ঠা ৬৯)। অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ (আ:) ধর্মকে জীবিত করবেন এবং শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করবেন।

(৩) এভাবে আরও একটি ইলহাম আছে, 'ওয়া'লামূ আন্নাল্লাহা ইউহ্ইল আরযা বা'দা মাওতিহা' (তাযকেরা, পৃষ্ঠা ৭৮)। অর্থাৎ মনে রাখো, ইসলামের দিক থেকে পৃথিবী মৃত হয়ে গেছে। আর এখন তিনি মসীহ্ মাওউদ (আ:)-কে এজন্যে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি একে পুনরায় জীবিত করেন।

(৪) চতুর্থ ইলহাম বিরুদ্ধবাদীগণের প্রসঙ্গে রয়েছে, 'জীন্দেগীকে ফেশন সে দূর যা পড়ে হ্যা, 'ফা সাহহিকহুম তাসহীকা' (তাযকেরা, পৃষ্ঠা ৮৭২)। এ ইলহামে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেই লোকদের খেয়াল ফ্যাশনের দিকে। কিন্তু ফ্যাশন (চাল-চলন) যা জীবন সৃষ্টিকারী তা থেকে দূরে সরে পড়েছে। এজন্য তাদের পিষে ফেলা হবে এবং দোয়া শিখানো হয়েছে, বলো, হে খোদা! তুমি এসব লোকদের মিটিয়ে দাও এবং নূহ (আ:)-এর যুগের ন্যায় ধ্বংস নিয়ে এস। যেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থলে দুনিয়াতে ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) পঞ্চম ইলহাম হলো 'মা আনা ইল্লা কাল কুরআনি ওয়া সাইয়াযহারু 'আলা ইয়াদাইয়া মা যাহারা মিনাল ফুরকান' (তাযকেরা, পৃষ্ঠা ৬১৭)। অর্থাৎ হে মসীহ্ মাওউদ তুমি লোকদের বলে দাও, আমি তো কুরআনের ন্যায়। যেভাবে কুরআন প্রাথমিক যুগে পরিবর্তন সাধন করেছিলো সেরকম পরিবর্তনই আমার যুগে সাধিত হবে।

(৬) ষষ্ঠ ইলহাম হচ্ছে, 'আসমানী বাদশাহাত' (তাযকেরা, পৃষ্ঠা ৬২২) অর্থাৎ খোদার রাজত্ব দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

এসব নিদর্শন ও ইলহামে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এই, পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস, এর শরীয়ত, এর সংস্কৃতি, এর সভ্যতা, এর জ্ঞান-বিজ্ঞান, এর অর্থনীতি, এর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, এর সামাজিকতা, এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেই পরিবর্তনের কিছু হলো জাতিগত। ব্যক্তিগত অংশ তো বক্তৃতা নসীহত ও ব্যক্তিগত চেষ্টা-প্রচেষ্টানির্ভর অর্থাৎ লোকদের বলা হয়, তারা যেন নামায পড়ে, তারা যেন রোযা রাখে, তারা যেন হজ্জ করে, তারা যেন সদকা-খয়রাত দেয়, আবার যেসব লোক এ ওয়াজ-নসীহতে প্রভাবিত হয় তারা নিজ নিজ পরিমন্ডলে ব্যবস্থাপনানির্ভর যেমন, আমরা যদি নিজেরা নামাযী হই তাহলে এটা আবশ্যকীয় নয় যে, অন্যান্য সবাইও নামাযী হয়। অন্য কেউ যদি নামায না পড়ে তাহলে আমাদের নিজেদের নামায নিজেদের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু কোন কোন আদেশ-নিষেধ এমন যা ব্যবস্থাপনানির্ভর হয়ে থাকে। আর আমরা সে সময় পর্যন্ত সাধন করতে পারি না যতক্ষণ অন্যরাও সে কাজ না করে। যেভাবে নামায রয়েছে এ আমরা এককভাবে পড়তে পারি। কিন্তু বা-জামাত নামায আমরা ততক্ষণ পড়তে পারি না যতক্ষণ অন্যান্য ব্যক্তি আমাদের সাথে না আসে। অতএব নামায বা-জামাত

একটি ব্যবস্থাপনার মুখাপেক্ষী অর্থাৎ এর জন্যে প্রয়োজন একজন ইমাম হোক আর তার পিছনে একজন বা একের অধিক মুক্তাদী হোক। অন্যান্য অজস্র রকমের এমন আদেশ-নিষেধ রয়েছে যা একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার মুখাপেক্ষী। এমন একটি ব্যবস্থাপনা, যা অস্বীকার করার কোন প্রকার সুযোগ নেই।

ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়ার বিজয়

বর্তমানে আমাদের জামাত, যেভাবে সুপ্রকাশিত ও প্রমাণিত ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মহান বিজয় লাভ করেছে। আর আমাদের এ বিজয় শত্রু কর্তৃকও স্বীকৃত। যেমন দেখে নাও হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালাম যখন বল্লেন, মসীহ্ নাসেরী মারা গেছেন তখন সব গয়ের আহমদী এক বাক্যে বলে উঠলো, এটা কুফরী। তাই এর ভিত্তিতে তারা তাঁর ওপর কুফরীর ফতোয়া আরোপ করলো এবং বল্লো, তিনি মসীহের অপমান করেছেন। কিন্তু আজ দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরাও দেখবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে অনেক লোক এমন আছেন যারা তাকে এখন মৃতই মনে করেন। আর এমন কাউকে দেখা যায়, মুখে তো স্বীকার করেন না কিন্তু অবশ্যই বলবেন, মসীহ্ জীবিত থাকুক বা মৃত তাতে আমাদের কী যায় আসে? এটা কি এমন একটা জরুরী বিষয় যে আমরা এর পেছন পড়ে থাকবো? এ পরিবর্তন বলে দিচ্ছে শত্রুও স্বীকার করে এখন এ অস্ত্র দ্বারা তারা আমাদের সাথে লড়তে পারছে না। পুরনায় দেখো, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সাল্লামের ওপর যে কুফরী ফতোয়া আরোপিত হয়েছে এতে কুফরী ফতোয়ার একটি কারণ এ-ও স্বীকার করা হয়েছিল, তিনি কুরআন মাজীদে নাসেখ মনসুখের অস্বীকারকারী। বিগত যুগের আলেমগণের মাঝে কেউ কেউ তো এগার শ আয়াতকে মনসুখ (রহিত) বলে নিধারিত করেছিলেন, কেউ কেউ ছয় শ আয়াত মনসুখ মনে করতেন। আর কেউ কেউ এর চেয়ে কম আয়াত মনসুখ বলতেন। এমন কি তিনটি আয়াতের নাসেখের স্বীকারকারী তো তারাও ছিলো যারা নাসেখের আইনানুগত্যতাকে ক্ষতিকর মনে করতো। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, এসব অনর্থক ও বাজে কথা। সারা কুরআনই পালনীয়। আবার যেসব আয়াতের ওপর আপত্তি করা হতো এবং বলা হতো, এগুলো মনসুখ। তিনি এগুলোর এমন আশ্চর্যজনক তত্ত্বসম্বলিত ব্যাখ্যা প্রদান করতেন তাতে ধারণা হতে লাগলো কুরআনের আসল আয়াতই তো এগুলো ছিল। আর এমন গুপ্ত ভান্ডার তাথেকে হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ:) বের করে রেখে দিতেন যে, বিশ্ব আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেত, তখন পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিতে কেন এসব লুক্কায়িত ছিলো। কিন্তু সে সময়ে যখন তিনি এসব কথা বল্লেন তখন তাঁর ওপর কুফরীর ফতোয়া আরোপিত হলো। তাঁকে মন্দ বলা হলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করা হলো। যদিও এ এমন একটি সূক্ষ্ম বিষয় ছিলো, দুনিয়ার কোন বুদ্ধিমান জাতির কাছে যদি এসব উপস্থাপন করা হতো তাহলে তাদের ওপর আনন্দের ঢেউ খেলে যেত। কিন্তু আজ যাও এবং দেখ মুসলমানদের অবস্থা কী, নিরানব্বইজন মৌলভী বলেন, কুরআনের কোন আয়াত মনসুখ নয়। আর সেসব আয়াত যেগুলো পূর্বে মনসুখ বলা হতো এখন কার্যকরী বলা হয় এবং এদের সেই অর্থই করা হয় যা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হে সালাম করতেন।

আহমদীয়তের বিজয় ও কর্মক্ষেত্র

মোটকথা ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তো আমরা বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরাভূত করেছি। কিন্তু যেখানে ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা বিরুদ্ধবাদীদের ওপর মহান সফলতা লাভ করেছি সেখানে কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের এ বিজয় পরিদৃষ্ট হচ্ছে না। আমরা কমপক্ষে দুনিয়ার সম্মুখে এ দাবী পেশ করতে পারি না, এ ক্ষেত্রেও আমরা বিরুদ্ধবাদীদের পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছি এবং অন্য কোন ব্যবস্থাপনা ছাড়া ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি।

উত্তম ব্যবস্থাপনা ও কর্মের পরিপূর্ণতা

এর কারণ এই, যেভাবে আমি বলেছি, উত্তম ব্যবস্থাপনা ছাড়া কর্মের পরিপূর্ণতা সাধিত হতে পারে না। এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জামাত কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসকে সঠিক করণে ব্যক্তিগত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এবং চাঁদা জমা করানোর কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও ব্যক্তিগত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় কখনো উত্তম ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করায় সফলতা লাভ করতে পারে না। কারণ–

১. অধিকাংশ লোক শরীয়তের তত্ত্বাবলী সম্বন্ধে অবহিত নয়। এজন্যে তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় দুর্বলতা থেকে যায়। আর তারা পৃথিবীতে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কেননা, তাদের ধর্মীয় অনুশাসন জানাই থাকে না। এর ফল এই দাঁড়ায়, একশ এর মাঝে দশটি অনুশাসন তো তারা কার্যকরী করে আর বাকী নব্বইটাই রেখে দেয়।

২. অন্যান্য লোক যারা ধর্মীয় অনুশাসন সম্বন্ধে অবহিত তাদের মাঝে একটি অংশ অলসও হয়ে থাকে। আর এক সীমা পর্যন্ত তারা আন্দোলন, দুনিয়ার লালসা ও বাহ্যিক চাপের মুখাপেক্ষী। জাতিকে তাদের নোটিশ দিতে হয়, আমাদের সাথী যদি হতে চাও তাহলে হাতে-কলমে কাজ করো নচেৎ আমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাও।

৩. তৃতীয় স্তরের লোক যারা ধর্মীয় অনুশাসনাদি অবহিত না হওয়ার কারণে বা অলস হওয়ার কারণে শরীয়তের বিরুদ্ধে কাজ করে। তাদের খারাপ প্রভাব অন্যদের ওপর আপতিত হয়ে থাকে। আর তারা তাদের কাজ-কর্ম দেখে কখনো কখনো একে নিজেদের ধর্ম বলে মনে করে থাকে। যেমন, কেউ যদি সফল ব্যবসায়ী হয় আর তিনি ধর্মের কোন অনুশাসনের ওপর কাজ করতে দুর্বলতা দেখান তখন লোকেরা তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কথা বলতে থাকে, এত বিরাট ব্যক্তি হয়ে তিনি কি ধর্মে দুর্বলতা দেখাতে পারেন? আর এভাবে তার ত্রুটিপূর্ণ কর্ম ধর্ম হিসেবে মেনে নেয়া হয়। যদিও এ-ও সম্ভব, এক ব্যক্তি বড় ব্যবসায়ী হোক বা বড় ধনী, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে সে নিরেট মূর্খ। অন্যদিকে একজন গরীব কাঙ্গাল ব্যক্তি অধিকতর ধার্মিক ও ধর্মীয় অনুশাসনাদি সম্বন্ধে অবহিত। অতএব এমন লোকের মন্দ প্রভাব অন্যদের ওপর অধিক হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো তারা তাদের ত্রুটিপূর্ণ কথাকে ধর্মীয় কথাবার্তা মনে করতে থাকে। আবার কখনো এ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গিয়ে এ প্রভাব গ্রহণ করে, অমুক ব্যক্তি অমুক আদেশ মানে না তো আমরা কেন মানবো? আর কোন কোন বাহ্যদর্শী লোক বড় বড় ব্যক্তিকে নকল করে তার অনুসরণে ধর্মীয় অবস্থাকে বিকৃত করে দেয়।

৪. চতুর্থত যাদের জানা আছে এবং যারা শরীয়তের ওপর আমল করতে চায় তারাও যতক্ষণ ব্যবস্থাপনা পূর্ণ না হয় আদেশ-নিষেধের এক অংশের ওপর আমল করতে পারো না। কেননা, কোন কোন আদেশ-নিষেধ দুটি দলের সাথে সম্পর্কিত। এক দল আমল না করলে অন্য দল আমল করতে পারে না। যেভাবে আমি বলেছি, বা-জামাত নামায সেই সময়েই পড়া যায় যখন কমপক্ষে ২ ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এক ব্যক্তি যদি থাকে আর সে বা-জামাত নামায পড়ার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করে তাহলে সেই সময় পড়তে পারে না যতক্ষণ অন্য ব্যক্তি তার সাথে নামায পড়তে প্রস্তুত না হয়। অথবা ধরুন, এক ব্যক্তির টাকা পয়সা ধার নেবার প্রয়োজন দেখা দেয় আর যদি সে কারও কাছে ধার চায় সেক্ষেত্রে তারা উভয়ে যদি মুসলমান হয় আর উভয়েই যদি একথার ওপর ঐকমত্য হয় যে, সুদ নেয়া ও দেয়া নিষেধ তাহলে তারা সুদ থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু তাদের মাঝ থেকে যদি একজন এর মান্যকারী না হয় তাহলে মনে করুন, একশ বা দু

শ টাকা ধার দিয়ে সে বলে দেয় এর ওপর শতকরা চার আনা সুদ লাগবে তাহলে টাকা নিয়ে এ লোক সুদ আদায় করতে বাধ্য হবে। অথবা ধরুন, সম্পত্তির ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে যদি পাঞ্জাবের একজন পিতা বলে, আমি আমার সম্পত্তি শরীয়তের বিধান মতে আমার সন্তানদের মাঝে বন্টন করবো। এতে ছোট পুত্র যদি খাড়া হয়ে গিয়ে বলে, আমি এ বন্টন করতে দেবো না অথবা তার স্ত্রী এর বিরোধিতা করে আর বলে, আমি এ বন্টন হতে দেবো না যেভাবে সাধারণ রীতি সেভাবে বন্টন করো, তাহলে আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও সে এ আদেশের ওপর আমল করতে পারবে না। কেননা, আইন বিরোধীদের পক্ষে।

এভাবে কয়েকটি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারও একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মুখাপেক্ষী। আর ব্যবস্থাপনা যদি না থাকে তাহলে এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে না। যেমন শরীয়ত বলেছে, দর দাম নির্ধারণ করো এবং এই রঙ্গে করো। এখন কোন ব্যবস্থাপনা যদি না থাকে তাহলে একাকী মানুষ কিভাবে দর দাম নির্ধারণ করতে পারে। অতএব যতক্ষণ ব্যবস্থাপনা না হয় যা উভয় পক্ষকে বাধ্য করে, সে ক্ষেত্রে এক পক্ষ জ্ঞান এবং আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না।

৫. আবার নতুন জামাতের জন্যে এটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক যুগের সাহাবাগণই আসল জ্ঞান প্রসার করতে পারেন। তাদের যুগে আমল না হলে পরে আর কোন পন্থা বাকী থাকে না। আর লোকেরা বলে দেয় সাহাবাগণ (রা:)-ই যখন এতবড় বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেন নি তখন আমরা কেন করবো?

৬. ষষ্ঠ কথা হলো এই, যতক্ষণ নিজেদের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা না করা হয় পুরানো দিনের ব্যবস্থাপনা মিটে যেতেই পারে না। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের ব্যবস্থাপনার কোন উত্তম দৃষ্টান্ত যতক্ষণ না দেখাবো পুরনো জিনিসকে লোকেরা কেন পরিত্যাগ করবে? যতক্ষণ আমরা আমাদের ব্যবস্থাপনার উত্তম দৃষ্টান্ত তাদের সামনে উপস্থাপন না করবো ততক্ষণ তারা কথার ওপর দৃঢ়তা দেখাবে আর পুরনো ব্যবস্থাপনাকেই অবলম্বন করতে থাকবে। আবার এ ছাড়াও একটি ভয়ানক কথা এই, স্বয়ং নিজেদের লোকেরাই এর শিকার হতে বাধ্য হবে। এজন্যে ব্যবস্থাপনা ছাড়া সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। আর উদ্দিষ্ট বিপ্লব কখনো সাধিত হতেই পারে না।

যথার্থ বিপ্লব সাধন করতে আমাদের কর্মকান্ড

অতএব যখন বিপ্লব ঘটানোর জন্যে অর্থাৎ পুরনো ব্যবস্থাপনা মিটিয়ে দিয়ে নতুন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের জন্যে এবং সেই সীমা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যেন নতুন আকাশ ও নতুন বিশ্ব সৃষ্টি হয় হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম আবির্ভূত হয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন এই উত্থাপিত হয়, আমরা এ প্রসঙ্গে কী কাজ করেছি? তোমরা আপত্তিকারীগণের কথা বাদ দাও। আস, আমরা সব আহমদী মিলে এ কথা সম্বন্ধে চিন্তা করি, ঘটনাটি কী? বহির্জগৎ থেকে যদি কোন ব্যক্তি হিন্দুস্তানে এসে যায় এবং তার কাছে আহমদী ও গয়ের আহমদীর পার্থক্য পরিদৃষ্ট না হয় আর ধরে নাও সে বধির লোকদের কাছে থেকে শুনেও সে ধারণা করতে পারে না অমুক আহমদী আর অমুক গয়ের আহমদী। আরও ধরে নাও সে নির্বোধ। স্বয়ং জিজ্ঞাসাবাদ করেও জানতে পারে না। কিন্তু তার চোখ আছে, যা দিয়ে সে দেখে এবং তার মস্তিষ্ক আছে যা দিয়ে সে উপলব্ধি করে। তাহলে কি সে আমাদের দেখে বলতে পারে, এসব লোকের আকাশ এসব লোকের জগৎ আলাদা এবং অন্যান্য লোকদের আকাশ অন্য ও অন্য লোকদের জগৎ আরেকটি? অথবা সে কিছু বুঝবে না এবং সে বলবে গয়ের আহমদীদের মাঝেও কিছু লোক নামায পড়ে এবং কিছু পড়ে না। তাদের মাঝেও কিছু কমজোর ও অসৎ আছে। আর সে এ ফলাফল যদি বের করে তাহলে বল সে কখন সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে জামাতে আহমদীয়ার আকাশ ভিন্ন, জামাতে আহমদীয়ার জগৎ ভিন্ন?

অতএব চিন্তা কর এবং মনোযোগ দাও আমরা এখন পর্যন্ত কী লাভ করেছি? আমরা কিছু মসলা বুঝে নিয়েছি। কিছু চান্দা দিয়ে দিই আর ব্যক্তিগত কিছু সংশোধন করে নিই। বেশির চেয়ে বেশি গয়ের আহমদী এবং আমাদের কোন পার্থক্য যদি নির্ণয় করা যায় তাহলে তা এই, গয়ের আহমদীদের মাঝে অধিক লোক মিথ্যে কথা বলে কিন্তু আমাদের মাঝে কম লোক মিথ্যে কথা বলে। তাদের অধিকাংশ লোক নামায পরিত্যাগ করে আর আমাদের অধিকাংশ লোক নামাযী হয়। কিন্তু আমাদের একটি অংশও নামায পরিত্যাগ করে থাকে। আবার তারা তবলীগ করে না আর আমাদের অধিকাংশই তবলীগ করে থাকেন। তারা অনেকেই কুরআন জানেন না আর তাদের তুলনায় আমাদের জামাতের লোকেরা অধিক কুরআন জানেন। কিন্তু অবস্থা তা-ই, রীতি সেটাই এবং জিনিস একই। অতএব আকাশ কি করে পরিবর্তিত হলো আর বিশ্ব কিভাবে পরিবর্তিত হলো? বরং আমাদের অবস্থা তো এই, এখন পর্যন্ত আমরা পুরনো ব্যবস্থাপনা ঘৃণা করতে শিখিনি। এখন পর্যন্ত আমাদের যুবক পাশ্চাত্য প্রেমিকই রয়ে গেছে। তারা পাশ্চাত্যের রীতি-নীতির অনুকরণে ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতাকে

ভুলে গিয়েছে। আর আমাদের উচিত ছিল, আমরা শত্রুকে নিপাত করে তাদের সভ্যতাকে টুকরো টুকরো করে দিতাম এবং তাদের সংস্কৃতির বদলে ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে দিতাম। এর পরিবর্তে আমরা সেই চেষ্টায়ই কালাতিপাত করছি আমাদের অমুক লোককে শত্রু যে ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের কাছ থেকে আমরা তাকে ফিরিয়ে আনব। কিন্তু আমরা স্বয়ং যখনই তাকে ফিরিয়ে আনি শত্রু আমাদের দশ ব্যক্তিকে আরও ছিনিয়ে নিয়ে যায় আর আমাদের সব প্রচেষ্টা এবং আমাদের সব দৌড়াদৌড়ি আবার সেই কাজেই ব্যয় হয়ে যায়। অতএব শত্রুর সংস্কৃতির বিনাশ সাধনের পরিবর্তে নিজেদের লোকদের ছাড়িয়ে আনতেই আমরা নিয়োজিত থাকি।

তাই প্রয়োজন আমরা যেন নেহায়েৎ এ প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি দিই আর দুনিয়ার সংস্কৃতি ও দুনিয়ার সভ্যতার বদলে ইসলামের সংস্কৃতি ও ইসলামের সভ্যতা এর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করি।

প্রকৃত বিপ্লব সৃষ্টিতে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের অংশীদারীত্ব

কেউ হয়ত বলবে আপনি তো বেশ ইলহামগুলো শুনিয়ে দিলেন এবং কুরআন করীমের আয়াতের প্রমাণগুলোও উপস্থাপন করলেন। কিন্তু আপনি কি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের চেয়ে অধিক ইলহাম সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন বা তাথেকে অধিক কুরআন জানেন? যদি না জানেন তাহলে আবার হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম কেন এর সূচনা করেন নি?

সুতরাং এর জবাব এই, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালাম-এর বিস্তারিত ইলহামসমূহের মাঝে এর সূচনা রেখে দেয়া হয়েছে এবং বারে বারে তিনি নিজ লেখাগুলোর মাঝে সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন, তিনি স্বয়ং বলেছেন, খোদা আমার হাতে এমন একটি পরিবর্তন নিয়ে আসবেন যেন আকাশ ও পৃথিবী নতুন সাজে সজ্জিত হয় এবং সত্যিকারের মানুষ সৃষ্টি হয়। এভাবে কয়েকটি ইলহাম ও কাশ্ফের মাধ্যেমে তিনি তাঁর এ মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন। তাই যখন এর সূচনা হয়ে গেছে তখন সূচনার জন্যে এটা জরুরী নয় যে তৎক্ষণাৎ এটা পূর্ণতায় পৌছে যায়। কিন্তু আমি বলছি, কুরআন করীমের একটি আদেশ অনুযায়ী যা ইলহাম হিসেবে তাঁর (আ:) ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি সেই কাজকে ধারাবাহিকতার সাথে শূরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর (আ:) মৃত্যুর পর সেই ধারাবাহিক পথ আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে অথবা সম্ভবত এ আল্লাহ্ তাআলার পরিকল্পনা ছিল, স্বয়ং তিনি বিরতি দিয়ে থাকবেন।

আর সেই আদেশ ছিলো এই, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **কাযারইন আখরজা শাতয়াহূ ফা আযারাহু ফাসতাগলাযা ফাসতাওয়া আলা সূকিহী ইউজিবুয্যুররা'আ লি ইয়াগীযা বিহিমুল কুফফার - ওয়া'আদাল্লাহুল্লাযীনা আমানূ ওয়া আমিলুস্ সলিহাতি মিনহুম মাগফিরাতাঁওয়া আযরান আযীমা** [অর্থ: তাদের বিবরণ এক শস্য ক্ষেতের ন্যায় যা স্বীয় অঙ্কুর নির্গত করে। পরে একে সুদৃঢ় করে ফলে এ আরও পুষ্ট হয়, অত:পর এ স্বীয় কান্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় যা কৃষককে পুলকিত করে যেন তিনি তাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের উন্নতি) দিয়ে কাফিরদের ক্রোধান্বিত করেন। তাদের মাঝ থেকে যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের সাথে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন (সূরা ফাতহ্: ৩০ আয়াতের শেষাংশ)] এতে জানা যায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর যুগে বিপ্লবের চারটি পর্যায় হবে। প্রথম *আখরজা শাতয়াহূ*– অর্থাৎ নীতি বর্ণনা করা হবে আর সেই সময়ে এমনই অবস্থা হবে যেভাবে শস্য ক্ষেতে ফসল স্বীয় অঙ্কুর নির্গত করে এবং সেরকম অবস্থা হবে না যা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো আর যাকে আল্লাহ্ তাআলা এভাবে বর্ণনা করেছেন– *আতাআমরুল্লাহ* অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ এসে গেছে (সূরা নাহল: ২) *আতাল্লাহু বুনইয়ানাহুম* অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের (ষড়যন্ত্রের প্রাসাদের ভিত্তিমূলে এসেছিলেন– সূরা নাহল: ২৭) বরং তথায় পর্যায়ক্রমে হবে, ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। প্রথমে ঈমানের একটি বীজ হবে, যা হৃদয়ভূমে বপিত হবে পরে সেই বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করবে এবং এ বীজের আকৃতিতে থাকবে না বরং ক্রমবর্ধমান আকৃতি ধারণ করবে। এর পরে উন্নতির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে যা আল্লাহ্ তাআলা *আযারাহূ* শব্দে বিধৃত করেছেন, অর্থাৎ সে সময়ে চারাগাছ দৃঢ় হয়ে যাবে এবং শরীয়তের চারাগাছকে ব্যবহারিক রূপ প্রদান করা হবে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে সে সময়ে আসবে যখন *ইসতাগলাযা*-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে। অর্থাৎ সেই দুর্বল চারাগাছ মোটাসোটা হবে। সেই আন্দোলনই যা প্রথমে নগণ্যরূপে প্রতিভাত হচ্ছিলো এবং দুনিয়ার সামান্য অংশে বিস্তার লাভ করেছিলো, গোটা বিশ্বে বিস্তার লাভ করবে। আর লোকেরা দলে দলে যেভাবে আহমদীতে রূপান্তরিত হতে থাকবে সেই শিক্ষা ও আন্দোলন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। মোটকথা *ইসতাগলাযা* শব্দে বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আবার চতুর্থ পর্যায় সেই সময় আরম্ভ হবে যখন *ফাসতাওয়া 'আলা সূকীহী* (অর্থাৎ যখন এ কান্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার) দৃশ্য দৃষ্টিপটে চলে আসতে থাকবে অর্থাৎ ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং সেই সামান্য ইসলামী সমস্যাসমূহ যা ইসলামী শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এ-ও কার্যকরীভাবে প্রবর্তিত হবে। আর বিশ্বের একটি মাত্র সংস্কৃতি হবে ও

একটি সভ্যতা হবে। এ *ফাসতাওয়া 'আলা সূকীহী* শব্দাবলী এমনই যেমন আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে কুরআন করীমে আছে যে, তিনি আরশের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেন। পরে বলেছেন, ইসলামী সংস্কৃতি যা আহমদীয়তের মাধ্যমে প্রবর্তিত করা হবে তা এতই মাহাত্ম্যপূর্ণ ও এতই উন্নত হবে, *ইউজিবুয্যুররা'আ* (অর্থাৎ কৃষককে পুলকিত করে) অন্যান্য জাতিবৃন্দের ও অন্যান্য কৃষ্টিসমূহের চোখ খুলে দেবে। আর তারা আশ্চর্য হতে গিয়ে আহমদীয়তের শস্য ক্ষেত দেখতে থাকবে এবং বলবে যে, এ শস্য ক্ষেত তো খুবই উত্তম। এটা সেই কথাই যা কুরআন করীম এ কথায় বর্ণনা করে দিয়েছে **রুবামা ইয়াওয়াদ্দুলাযীনা কাফরূ লাও কানূ মুসলিমীন** (অর্থঃ যারা অবিশ্বাস করেছে তারা প্রায়ই কামনা করে, হায়! তারাও যদি মুসলমান হতো - সূরা হিজরঃ ৩) অর্থাৎ অবিশ্বাসীরাও তাদের সভাসম্মেলনে বলেছে, আসলে তো এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী কিন্তু তবে তার শিক্ষা বড়ই উন্নত মার্গের। তাদের প্রাণেও এ আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছে হায়! তারাও যদি মুসলমান হতো। এভাবেই বলা হয়েছে, যখন আহমদীয়তের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হবে আর ইসলামী শাসনব্যবস্থা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিস্তার লাভ করবে তখন *ইউ'জিবুয্যুররা'আ* (কৃষককে পুলকিত করবে) অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বলতে থাকবে এখন এর মোবাবেলা হতে পারে না *লি ইয়াগীযা বিহিমুল কুফফার* (যেন অবিশ্বাসীদের ক্রোধান্বিত করে) কিন্তু যারা বিরোধী এবং কঠোর শত্রু হবে তারা তো এ বিপ্লবকে দেখে (হিংসায়) মরেই যাবে এবং বলবে, এখন আমাদের দিয়ে আর কিছু হতে পারে না। ইত:পূর্বে যাদের কথা বলা হচ্ছিলো তারা এমনই যাদের প্রকৃত স্বভাব জাগ্রত হবে। তারা এ ব্যবস্থাপনার উন্নতি ও প্রাধান্য স্বীকার করবে এবং বলবে, হায়! আমাদের যদি এ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হতো। কিন্তু যারা কঠোর শত্রু হবে তারা (হিংসায় জ্বলতে থাকবে এবং) বলবে, এখন আমাদের বিজয়ের আর কোন পথ নেই। অতএব মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের যুগ ছিলো প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ বীজ তলায় অঙ্কুর নির্গত হচ্ছিলো। কিন্তু এখন সময় এসে গেছে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে যেন এসব লোকের উপস্থিতিতে, যারা নবুওয়তের জ্যোতি থেকে অংশ লাভ করেছে, এ কাজ পূর্ণতা লাভ করে। এ কাজ যদি আজ না হয় তাহলে পরে কখনো হতে পারে না।

তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য

আমি তাহরীকে জাদীদের প্রাথমিক পর্যায়ে এদিকে পদক্ষেপ রেখেছিলাম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা-বার্তাকে আমি বিরতি দিয়ে বলে যাচ্ছিলাম। আর আমি

তোমাদের নিজেদের মনে চিন্তা করতে বলেছিলাম। পরিশেষে ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তো আমরা শত্রুকে পরাজিত করেছি কিন্তু আমল ও কর্মের ক্ষেত্রে আমরা এখন একে পরাজিত করতে পারিনি, এর কী কারণ। আমি আশা করছি আপনারা আপনাদের অন্তরে একথা চিন্তা করে থাকবেন। কিন্তু আমার অন্তরের সংকল্প এখন এটা ছিলো আমি তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় পর্যায়ের কয়েকটি কথা জলসা সালানার সময়ে বর্ণনা করবো যে, এখন জামাতের এক অংশ আমার সম্মুখে উপস্থিত আছে আর আমি তাদের জিজ্ঞেস করবো, তারা সেসব কথায় আমল করতে প্রস্তুত আছে কি নেই।

সুতরাং আজ আমি এর ঘোষণা দিতে চাই, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

আল ঈমানু বিযউন ওয়া সাবউনা শু'বাতান। *আফযালুহা কাউলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আদনাহা ইমাত্বাতুল আযা'আনিত্বরীকি* (অর্থ: ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা আছে। সর্বোত্তম হলো আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই বলা এবং সবচে' সামান্য হলো পথ থেকে কষ্টকর দ্রব্য অপসারণ) অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা কখনো কখনো *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* পড়ে বলে দাও আলহামদু লিল্লাহ আমরা মু'মিন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা মুসলমান। কিন্তু [রসূলুললাহ (সঃ)] বলেন, এটা ভুল। সর্বৈব ভুল এবং নিঃসন্দেহে ভুল। প্রথম তো কেবল মুখে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলা কোন মূল্য রাখে না। আর কিছু মূল্য যদি থাকেও তাহলে 'মনে রেখ, *আল ঈমানু বিয'উন ওয়া সাব'উনা সু'বাতান*– ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা আছে। এসবের ওপর আমল করা তোমাদের জন্যে জরুরী। এখানে *বিযউন ওয়া সাব'উনা* অর্থ বহুল সংখ্যায় আর এটা আরবী বাচনভঙ্গী। উর্দূতেও যখন কাউকে এটা বলতে হয়, আমি তোমাকে বহুবার একথা বলেছি তখন বলা হয় আমি তোমাকে একশ বার এটা বলেছি। এর অর্থ এটা নয়, একশ বারই বলা হয়েছে বরং এর অর্থ অনেকবার বলা হয়েছে। এভাবে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানের সত্তর থেকে অধিক বিভাজন ও শাখা রয়েছে অর্থাৎ বহু বিভাগ রয়েছে *আফযালুহা কাউলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু* বলা। কিন্তু এর পর অন্যটি, পরে অন্য আর একটি এবং পরে অন্য আর একটি এবং পরে অন্য আর একটি বিভাগ। এভাবে ঈমানের পরের বিভাগগুলো সামনে আসতে থাকে এমন কি যে, ঈমানের একটি সামান্য বিভাগে এটাও অন্তর্ভুক্ত *ইমাত্বাতুল আযা'আনিত্বরীকি* রাস্তায় পড়ে থাকা কাঁটা অপসারণ। কঙ্কর পাথর থাকলেও তা অপসারণ করা উচিত। এমনভাবে কষ্টদায়ক যে কোন বস্তুই হোক একে অপসারিত করে দেয়া। মোটকথা যাকে লোক ঈমান বলে এবং যার ওপর আনন্দে স্ফীত হয় না। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু

আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ কোন একটি জিনিসের নাম নয় বরং শত শত এমন আমল ও সৎকর্ম রয়েছে যার সম্মিলিত নাম ঈমান। আর যখন পর্যন্ত সেসব আমলের চারিটি দেয়াল পরিপূর্ণ না করা হয় ঈমানের সৌধ পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে না। সেসব আমলের মাঝে নগণ্য থেকে নগণ্য সামান্য থেকে সামান্য আমল এই যে, *ইমাত্বাতুল আযা'আনিত্বরীকি* অর্থাৎ রাস্তা পরিষ্কার করা হয় এবং নোংরা ও কষ্টদায়ক বস্তুকে অপসারণ করা হয। যেমন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলাম কোন একটি জিনিসের নাম নয়। বরং তৌহীদের ওপর ঈমান আনা, ভাল ও মন্দের নিয়তির ওপর ঈমান আনা। নবীগণের ওপর ঈমান আনা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের ওপর ঈমান আনা। বেহেশ্‌তের ওপর ঈমান আনা দোযখের ওপর ঈমান আনা। দোয়ার কবুলিয়্যতের ওপর ঈমান আনা। আল্লাহ্‌ তাআলার গুণাবলীর ওপর ঈমান আনা। এরপর নামায পড়া। রোযা রাখা, হজ্জব্রত পালন করা। যাকাত আদায় করা। সদকা-খয়রাত করা। শিক্ষাগ্রহণ করা। শিক্ষা প্রদান করা। পিতা-মাতার সেবা করা। মানব-সন্তানের কল্যাণের জন্যে শারীরিক সেবা প্রদান করা। ইসলামের জন্যে মর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সুধারণার মাধ্যমে কাজ করা। সাহসী হওয়া। উচ্চ সাহসিকতাসম্পন্ন হওয়া। ধৈর্য ধারণ করা। কোমলপ্রাণ হওয়া। শ্রমের মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখা। উদ্যমশীল হওয়া। সাদাসিদা জীবনযাপন করা। মধ্যপথ অবলম্বন করা। ন্যায়বিচার করা। পরোপকার করা। দানশীল হওয়া। বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা। অন্যকে শ্রেষ্ঠ ভাবা ও কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি করা। ক্ষমা করা। অন্যকে সম্মান দেখানো। লোকদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা। সরকারের প্রতি অনুগত হওয়া। তরবিয়ত [চরিত্র গঠন] করা। জাতির শত্রুদের সাথে সম্পর্ক না রাখা। আল্লাহ্‌-প্রেম সৃষ্টি করা। (আল্লাহ্‌র ওপর) ভরসা করা। তবলীগ করা। মিথ্যা কথা না বলা। চোগলখুরী না করা। একের কথা অন্যকে না বলা। গালি-গালাজ না করা। ধোঁকাবাজি না করা। আত্মসাৎ না করা। যুলুম নির্যাতন না করা। ফেৎনা-ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি না করা। অপবাদ না দেয়া। অন্যকে হেয় দৃষ্টিতে না দেখা। হাসি-বিদ্রূপ না করা। বেকার না থাকা। আলস্য না করা। পরিশ্রম ও বুদ্ধির সাথে কাজ করা। এসব ছাড়া আরও এ রকম হাজারো কথা ঈমানের অংশ বলে পরিগণিত। এমনকি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঈমানের মার্গ এটা, রাস্তায় চলতে গিয়ে কোন পাথর যদি দেখা যায় তাহলে তা রাস্তা থেকে অপসারণ করে দাও। কোন কঙ্কর থাকলে তা অপসারণ করো। অতএব এটা মনে করো না যে, *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলে বা *মুহাম্মদুর রসূলূল্লাহ* বলে অথবা *আমান্না বিল মাসীহিল মাওউদ* বলে বা নামায পড়ে অথবা রোযা রেখে তোমরা মু'মিন হয়ে যাবে। আর তোমাদের ঈমান লাভ হয়ে যাবে। ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসের নাম হলো ঈমান। ইবাদতের

মসলা সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বিচারকার্য, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, সচ্চরিত্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে স্বীয় জীবনে এবং দুনিয়াতে প্রসার করা। এর উত্তম অংশ হলো *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্* এবং ক্ষুদ্র অংশ হলো রাস্তা থেকে কাঁটা অপসারণ করা। যে-ব্যক্তি এর চেষ্টা করে না সে মু'মিন হয় নি। সে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজও করেনি।

দেখো! রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, *আল ইমামো জুন্নাতুন ইউকাতালু মিঁওয়ারায়েহি* অর্থাৎ ইমাম ঢালস্বরূপ। আর তার পিছনে থেকে তোমাদের শত্রুর সাথে সংগ্রাম করা উচিত। অতএব যতক্ষণ আমি ঘোষণা করিনি লোকেরা এক সীমা পর্যন্ত স্বাধীন মনে করতো। কিন্তু সেই ব্যক্তিকেই জামাতের সদস্য বলা যেতে পারে, যে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ ফরমান ও নির্দেশ– *আল ইমামো জুন্নাতুন ইউকাতালু মিঁওয়ারায়েহি*– ইমাম ঢালস্বরূপ অনুযায়ী তার পেছনে থেকে ইসলামের জন্যে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

জামাতে আহমদীয়ার দায়িত্বাবলী

অতএব আমি ঘোষণা করছি, আমাদের জামাত যেন নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করে। এখন সময় এসে গেছে। রসূলে করীম (স:)-এর সুন্নত পুনরুজ্জীবনের জন্যে বাস্তবমুখী আমল ও কার্যপ্রণালীও গ্রহণ করে। যতক্ষণ আমি ঘোষণা না দিয়েছি লোকদের জন্যে পাপ হয় নি। কিন্তু এখন যখন ইমাম ঘোষণা দেয়, সুন্নত ও শরীয়তের পুনরুজ্জীবনের সময় এসে গেছে তখন কারও জন্যে পিছনে পড়ে থাকা ঠিক হবে না। আর এখন যদি অবহেলা দেখানো হয় তাহলে কখনো কিছু হবে না। আজ যেহেতু সাহাবাগণের সংখ্যা কম রয়ে গেছে সেহেতু এর পরও এ কাজ সাহাবাগণের জীবনেই সাধিত হতে পারে। আর সাহাবাগণ যদি না থাকেন তাহলে পরে মনে রেখ এ কাজ কখনো হবে না।

সংস্কৃতি ও কৃষ্টি প্রসঙ্গে ইসলামী শিক্ষা

(১) আখলাকে হাসনা বা উত্তম চরিত্রঃ দেখো রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (ক) *ইন্নাল খুলুকা বি'আউদ্দীন অর্থাৎ* উত্তম চরিত্র ধর্মের পাত্র। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো কখনো পাত্র ছাড়া দুধ থাকতে পারে? এটাতো হতে পারে পাত্র থাকুক কিন্তু দুধ না থাকুক। কিন্তু এটা হতে পারে না বিনা পাত্রে দুধ থাকতে পারে। অতএব উত্তম চরিত্র ধর্মের পাত্র। কারও কাছে এ পাত্র যদি না থাকে আর সে বলে, আমার কাছে ঈমানের দুধ আছে তাহলে সে মিথ্যে বলে। (খ) *ইন্নামা বুয়িসতু লি উতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক* অর্থাৎ

আমি এজন্যে প্রেরিত হয়েছি যেন উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিই।

(২) **মো'আমেলাত বা আচার-আচরণ:** এরপর আচার-আচরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, আশরাফুল ঈমানি আঁইয়ামানাকান্নাসু ওয়া আশরাফুল ইসলামি আঁইয়াসলামান্নাসা মিল্লিসানিকা ওয়া ইয়াদিকা অর্থাৎ উচ্চ মার্গের ঈমান হলো, লোকেরা তোমার হাত থেকে নিরাপদ থাকে আর কারও তোমার পক্ষ থেকে দুঃখ না লাগে। আর উচ্চ মার্গের ইসলাম হলো লোকেরা তোমার হাত থেকে রক্ষা পায় অর্থাৎ তুমি কথায় তাদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধাবে না, হাত দিয়েও তাদের কোন কষ্ট দিবে না।

(৩) **জাতীয় সেবা:** জাতীয় সেবা প্রসঙ্গে নবী করীম (স:) বলেছেন, *ইন সাবরা আহাদিকুম সা'আতান ফী বা'যি মাওয়াত্বিনিল ইসলামি খয়রুল্লাহু মিন আঁইয়া'বুদাল্লাহা আরবা'ঈনা ইয়াওমান* অর্থাৎ ইসলামের সেবায় কোন ব্যক্তি তোমার সাথে যদি এক ঘন্টা ব্যয় করে যার সাথে ব্যক্তিগত কল্যাণের কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে সে চল্লিশ দিনের ইবাদতের চেয়েও অধিক সোয়াব ও পুণ্য লাভ করবে।

(৪) **হালাল রিযক:** হালাল রিযক সম্বন্ধে তিনি (স:) বলেছেন, আল'ইবাদাতু *'আশারাতু আজযাইন তিস'আতুম্মিনহা ফী ত্বলাবিল হালালি* অর্থাৎ খোদা তাআলার ইবাদতের দশটি অংশ রয়েছে। এক অংশ তো নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। কিন্তু ইবাদতের নবম অংশ হালাল রিযক খাওয়া। মোটকথা তোমরা যদি নামাযও পড়, রোযাও রাখ, হজ্জও কর, যাকাতও প্রদান কর, কিন্তু নিজেদের ব্যবসায় ধোঁকাবাজি করে থাক, তাহলে তোমরা এক ভাগ দুধের সাথে নয় ভাগ অপবিত্র পানি মিশ্রিত করছো। আর নিজেদের গোটা ইবাদত ধ্বংস করে দিচ্ছ। অথবা তোমরা যদি কাউকে এক পয়সার একটি জিনিষ দিতে চাও আর নিক্তির কাঁটা পেছনে একটু খানি ঝুঁকিয়ে দাও তাহলে তুমি এ সামান্য অবাসধানতা বা সামান্য চালাকি ও সতর্কতার সাথে নিজের হালাল সম্পদে নয়ভাগ দুষিত পদার্থ মিশিয়ে দিয়ে থাক এবং স্বীয় সারা জীবনের ইবাদত বিনষ্ট করে দিচ্ছ। কেননা, নামায রোযার আদেশ পালনকালে কেবল এক দশমাংশ দায়িত্ব পালন করা হয়। বাকী নয় ভাগ আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালনে হালাল রিযক আয় করে পালিত হয়।

(৫) **কর্মতৎপরতা ও পরিশ্রম:** কর্মতৎপরতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে কাজ করার ব্যাপারে তিনি (স:) বলেছেন, *ই'মাল 'আমালাম রিইন ইয়াযুন্ন আঁল্লাইয়ামূতা আবাদ্দাওয়াহ্যার হাযরাম রিইঁইয়াখশা আঁইয়ামূতা গাদান* অর্থাৎ তোমরা যখন

দুনিয়ার কাজকর্ম কর তখন স্মরণ রেখো সে সময়ে ইসলামী শিক্ষা এই, এমন পরিশ্রম ও এমন কর্মতৎপরতার সাথে কর যেন তোমরা চিরস্থায়ী হবে আর কখনো মারা যাবে না। এটা যেন বলা না হয় কী কাজ করবো মরেইতো যাবো? অথবা কেন অযথা পরিশ্রম কর শেষ পরিণাম তো ধ্বংস ও বিলীনতা। তিনি (সঃ) বলেন, বরং এভাবে করো, যেন তোমাদের মরণের চিন্তাও নেই। *ওয়াহযার হাযরামরিহঁইয়াখশা আঁইয়ামূতা গাদান* কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এভাবে ভয় করো যেন তোমরা কালই মরে যাবে। এ দুটো মার্গই তোমাদের লাভ হওয়া উচিত। অর্থাৎ এক দিকে তোমরা এতই কর্মতৎপর ও এতই উৎফুল্ল যেন তোমরা কখনোই মারা যাবে না। আর অন্য দিকে এতই ভীত যেন তোমরা বেঁচেই নেই।

(৬) **মানব-গোষ্ঠীর কল্যাণ কামনাঃ** মানব-গোষ্ঠীর কল্যাণ কামনা প্রসঙ্গে তিনি (সঃ) বলেছেন, *'আলা কুল্লি মুসলিমিন সদাকাতুন ফাইল্লাম ইয়াজিদ ফাল ইয়া'মাল বিইয়াদিহী ফাইয়ানফাউন্নাসা* অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে সদকা খয়রাত করা আবশ্যক এবং কেউ যদি, বলে আমি তো গরীব, আমি কোথা থেকে চাঁদা দিবো। যেভাবে কোন কোন লোকের কাছে যখন চাঁদা চাওয়া হয় তখন তারা বলে, আমাদের কাছ থেকে কী চাঁদা নিবে আমাদেরকে তো তোমাদের চাঁদা দেয়া উচিত। কেননা, আমরা গরীব। তাই বলা হয়েছে, *ফালইয়া'মাল বিয়াদিহী* এমন লোকদের উচিত তারা জাতীয় কাজ নিজেদের হাতে করে দেয়। কেননা, তারা একথা বলতে না পারে আমাদের হাতও তো নেই। তারা বেশির পক্ষে একথা বলতে পারে, আমাদের কাছে টাকা নেই। তাই বলা হয়েছে বেশ টাকা-পয়সা নেই তো হাত দিয়ে কাজ করো। মোটকথা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সদকা-খয়রাত কেবল ধনীদের ওপরই ফরয করেন নি বরং গরীবদেরও এতে শামেল করে নিয়েছেন। আর বলেছেন, সদকা-খয়রাত করা প্রত্যেক মানুষের কাজ। যে অর্থ দিতে পারে সে যেন অর্থ দেয় আর যে অর্থ দিতে পারে না সে যেন নিজের হাতে কাজ করে দেয়। এজন্যে তাহরীকে জাদীদে আমি বলেছি, নিজের হাতে কাজ করো। আর যদি কেউ হাতও নাড়াতে না পারে সে যেন কেবল দোয়া করতে থাকে। কেননা, এক্ষেত্রে এটাই তার কাজ বলে মনে করা হবে।

(৭) **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাঃ** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যাপারে তিনি (সঃ) বলেছেন, *আন্নাযাফাতু মিনাল ঈমানি* অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ বিশেষ। আবার বলেছেন *আখরিজু মিন দীলাল গমারি মিন বুয়ুতিকুম ফাইন্নাহূ মুবীতুল খাবীসি ওয়া মাজলিসুহূ* অর্থাৎ সেই দস্তরখান যাতে চর্বি লেগে গেছে তা নিজেদের ঘর থেকে বাইরে নিক্ষেপ করো। কেননা, এ মন্দ জিনিষ এবং

নোংরার কেন্দ্র অর্থাৎ এতে মাছি বসে, পোকা-মাকড় আসে এবং রোগের জীবাণু বহন করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, আজকাল লোকেরা একে পুণ্য মনে করে যে কাপড়-চোপড় ততক্ষণ ধোয়া উচিত নয় যতক্ষণ না ছিঁড়ে যায়।

(৮) **সত্যবাদিতা:** সত্যবাদিতা সম্বন্ধে তিনি (স:) বলেছেন, *ইয়াকুম ওয়াল কিযবা ফা ইন্নাল কিযবা লা ইয়াসলুহু ফীল জিদ্দি ওয়ালাল হাযলি ওয়ালা ইয়া'ইদির রাজুলূ সাবিয়্যাহূ সুম্মা লা ইয়াফীলাহূ* অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা মিথ্যা থেকে আত্মরক্ষা করো এবং এটা খুব ভালভাবে বুঝে নাও মিথ্যা হাসি-ঠাট্টাও বৈধ নয় বা গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থায়ও বৈধ নয়। কোন কোন লোক এটা বলে দিয়ে থাকে, আমরা মিথ্যে বলিনি হাসি-ঠাট্টা করেছি মাত্র। কিন্তু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একেও মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন। বরং তিনি (স:) এ থেকেও অধিক সাবধানতার সাথে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, *লা ইয়া'ইদির রাজলূ সাবিয়্যাহূ সুম্মা লাইয়াফীলাহূ* অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততির সাথেও মিথ্যা অঙ্গীকার করো না। তোমরা কখনো কখনো সন্তান-সন্ততির সাথে যখন তারা কাঁদতে থাকে তখন বলো, আমরা তোমাদের মিষ্টি এনে দেবো। পরে সে যখন চুপ হয়ে যায় তখন তোমরা তাকে মিষ্টি এনে দাও না। রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমনও করবে না। কেননা, এটা মিথ্যা এবং কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা জায়েয নয়।

(৯) **আয়-উপার্জন:** আবার নিজে আয়-উপার্জন করে দিনাতিপাত করাও ইসলামের অঙ্গ। যেমন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সমীপে একবার সাহাবা কেরাম (রা:) এলেন। তাঁরা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! একব্যক্তি দিন রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেয়। তাঁরা জানতে চাইলেন, এ কি ভাল না ভাল নয়? নবীদের জবাব খুবই হৃদয়গ্রাহী ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে! তিনি (স:) বল্লেন, সে রাত দিন যদি ইবাদতে মশগুল থাকে তাহলে সে খায় কোথা থেকে? তারা বল্লেন, লোকেরা দিয়ে থাকে। তিনি বল্লেন, তাহলে পরে যারা তাকে খাবার ও পানীয় সরবরাহ করে তারা সবাই তাথেকে উত্তম।

এভাবে হাদীসে এসেছে একবার রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এক বৈঠকে বসা ছিলেন আর তার পাশ দিয়ে এক যুবক অতিক্রম করছিলো। সে ছিলো খুবই লম্বা সুঠামদেহী ও শক্তিশালী পুরুষ। আর সে খুব দ্রুত বেগে নিজের কাজে চলে যাচ্ছিলো। কোন কোন সাহাবী (রা:) তাকে দেখে ঘৃণাব্যঞ্জক এমন কোন কথা বল্লেন, যার অর্থ এই, তোর কপাল পুড়ুক! আরও বল্লেন, তার যৌবন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় হলে কতই ভাল হতো! রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, এটা বলার অর্থ কী যে তার কপাল

পুড়ুক। যে-ব্যক্তি এজন্যে দ্রুত বেগে কোন কাজ করে যাতে তার স্ত্রীর উপকার হয় তাহলে সে খোদার পথেই কাজ করছে। আর যে-ব্যক্তি এজন্যে ঘুরে ফিরে ব্যস্ততার সাথে কাজ করে যে, নিজের সন্তান-সন্ততির মুখে হাসি ফুটাতে চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রে সেও খোদার পথেই কাজ করছে। একথা অবশ্যি ঠিক যে-ব্যক্তি এজন্যে ব্যস্ত হয়ে কাজ করে যেন লোকেরা তার প্রশংসা করে এবং তার শক্তির প্রশংসা করে তাহলে সে শয়তানের রাস্তায় কাজ করে। কিন্তু হালাল জীবিকার জন্যে চেষ্টা করা এবং আয় করে সংসার চালানো তো আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাজ কারর শামেল।

(১০) **বিষয় সম্পত্তির সংরক্ষণের আদেশঃ** এভাবেই ইসলাম বিষয় সম্পত্তির সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষভাবে নির্দেশাদি প্রদান করেছে। আর রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ বিষয় সম্পত্তি যদি বিক্রি করে খেয়ে যায় তাহলে সে কোন কাজের নয় এবং সে খোদা তাআলার কাছে থেকে কল্যাণ লাভ করার যোগ্যই নয়।

ইসলামী আদেশ-নিষেধের কেবল এ কয়েকটি কথা বর্ণনা করলাম। নচেৎ ইসলামী আদেশ-নিষেধের আরও শত শত দিক রয়েছে। আর সেসব বিষয় প্রবর্তন করাকে রাষ্ট্রীয়নীতি বলে এবং এ রাষ্ট্রনীতি ইসলামের একটি জরুরী অংশ।

ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার উপায়সমূহ

কিন্তু এই অবশ্য-করণীয় বিষয়গুলো ততক্ষণ সম্পন্ন করা যেতে পারে না যতক্ষণ না নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয়। কিন্তু এজন্যে আবশ্যকঃ

১. ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন সাধনঃ প্রথমত জামাতের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন আনুন এবং তাদের বলুন মু'মিন এবং আহমদী হওয়ার অর্থ এটা নয় তোমরা *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু* বলেছ আর সব কাজ করা হয়ে গেছে অথবা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের ওপর ঈমান এনেছো আর সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। বরং ঈমানের পুর্ণতার জন্যে শত শত বিষয় জরুরী। এগুলো সংস্কৃতি, সামাজিকতা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক রাখে। যতক্ষণ গোটা অংশ মজবুত না হয় কোন ব্যক্তি ততক্ষণ প্রকৃত অর্থে মু'মিন বলে পরিগণিত হতে পারে না। আর এটা আলেম সম্প্রদায়ের কাজ যে, তার লোকদের ধ্যান-ধারণাকে বদলিয়ে দেন। আর তাদের বলে দেন যে, তাদের সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। কিন্তু আমাদের আলেম সম্প্রদায়ের অবস্থা এই, তারা বাইরে গেলে ওফাতে মসীহ্ ও খতমে নবুওয়তের ওপর বক্তৃতা দিয়ে ফিরে আসেন। আর তারা মনে করেন,

তারা তাদের কর্তব্য সম্পন্ন করে এসেছেন। যেন তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি অট্টালিকা নির্মাণের জন্যে বের হলো। কিন্তু একটি ইট স্থাপন করে ফিরে এলো এবং মনে করলো, তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং আলেম সম্প্রদায়ের কাজ এই, তারা যেন লোকদের মাঝে এ প্রেরণা সৃষ্টি করেন যে, সুন্নত পুনরুজ্জীবন, শরীয়ত পুনরুজ্জীবন করার জন্যে তাদের এক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। আর এজন্যে তাদের প্রস্তুত হয়ে যাওয়া উচিত।

২. পরিপূর্ণ ইতায়াত ও আনুগত্যঃ দ্বিতীয়ত এ কাজের জন্যে জামাতের লোকদের মনে সংকল্প সৃষ্টি করা জরুরী যে, আমরা পরিপুর্ণভাবে ইতায়াত ও আনুগত্য করবো। এতে আমাদের যে কোন ক্ষতির সম্মুখীনই হতে হোক না কেন। কেননা, এসব বিষয় নেযাম ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। আর একটি বিষয়ও যদি এই নেযাম থেকে বের হয়ে যায় তাহলে সব কাজ ওলট-পালট হয়ে যায়। যেমন, আমাদের শরীয়ত এক আদেশ দেয়, অমুক অমুক মানের কোন বস্তু যদি পাওয়া যায় তাহলে বিক্রি করো খারাপ ও সাধারণ বস্তু বিক্রি করো না। এখন আমরা যদি এ আদেশ দোকানদারদের দিয়ে পালন করাই এবং সে এ আদেশ মান্য না করে তার ব্যাপারে আমরা এ আদেশ দিয়ে দিই যেন জামাতের লোকেরা তার কাছ থেকে সদায় না কিনে এহেন অবস্থায় কোন কোন লোক এমন আছে যারা দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে ইনি লোকদের রিয্ক নষ্ট করছেন, তাহলে ইসলামের নির্দেশ পৃথিবীতে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আর আমরা যদি এভাবে এক এক করে লোকদেরকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দিই তাহলে আমাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় হবে যার সম্বন্ধে বলা হয়, সে কারও কাছে গিয়েছিলো শরীরে বাঘের চিহ্ন খোদাই করতে। সে যখন বাঘের চিহ্ন খোদাই করার জন্যে দেহে সূঁচ ফুটাতে লাগলো সে কষ্ট পেল এবং বল্লো, তুমি কি সূঁচ ফুটাচ্ছো? খোদাইকারী জবাব দিলো, বাঘের ডান কান। এরপর সে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা বাঘের ডান কান না থাকলে সে কি বাঘ থাকে না থাকে না? খোদাইকারী বল্লো, থাকে তো বটে। তখন সে বল্লো, আচ্ছা তাহলে এটা ছেড়ে দাও অন্য কাজ করো। পরে সে অন্য কান খোদাই করতে চাইলো। তখন এর ওপরও সে আগের মতই বল্লো। আর এভাবে সে দেহের সব অংশের বেলায়ই বলে চল্লো। পরিশেষে খোদাইকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লো। তখন সেই ব্যক্তি বিচলিত হয়ে বল্লো, তোমার কাজ ছেড়ে দিয়ে বসেছো কেন? তখন খোদাইকারী বল্লো, এজন্যে যে এখন বাঘের কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

এমনিভাবে আমরাও যদি দেখি লোকেরা ইসলামী আদেশ-নিষেধের অবাধ্যতা করছে এবং আমরা যদি তাদের অবহেলা করে চলি তাহলে ইসলামের ও

জামাতের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অতএব আমাদের কর্তব্য এই উপদেশ দানে যারা সংশোধিত হয় তাদের উপদেশ দিয়ে সংশোধন করা এবং যারা উপদেশে সংশোধিত হয় না তাদের বাধ্য করা যেন তারা তাদের কর্ম দিয়ে আহমদীয়তের বদনাম না করে অথবা পুনরায় তওবা করে জামাতের সাথে মিশে যায়। আর এ কাজে জামাতের পরিপূর্ণ সহযোগিতা করা দরকার। আর জামাতের উচিত এ প্রসঙ্গে পূর্ণ আনুগত্য করার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে যায়। এতে তাদের পিতাকে যদি পরিত্যাগ করতে হয় বা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে হয় বা পুত্রকে পরিত্যাগ করতে হয় বা ভাইকে পরিত্যাগ করতে হয় তবুও।

৩. **পুস্তকাদি:** সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে তৃতীয় জরুরী বিষয় এই। এরূপ পুস্তকাদি প্রণয়ন করা দরকার যাতে ইসলামের নীতিগত শিক্ষা বা নীতিগত শিক্ষার আলোকে আদেশ-নিষেধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়।

৪. **বৈধ শাসন:** চতুর্থত এ বিষয়ের প্রয়োজন। শরীয়তের প্রবর্তন কল্পে বৈধ শাসন, যাকে রাষ্ট্রীয়নীতি বলা হয়, এটা কাজে লাগানো। আর কারও পদস্খলন হলো বা কেউ পরীক্ষায় নিপতিত হলো সেই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না দেয়া। রাষ্ট্রীয়নীতির প্রকৃত অর্থ এটাই, শরীয়তের প্রবর্তনকল্পে যে পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয় এতে যতটা প্রয়োজন দেখা দেয় এবং যতটুকু পর্যন্ত অনুমতি রয়েছে শাসন করা যেতে পারে। আর ইসলামের আলেমবৃন্দ এর ওপর অনেক পুস্তকাদি লিখেছেন এবং তারা প্রমাণ করেছেন শক্তি প্রয়োগ করে যাদের মানানো হয়েছে তাদের শাসনের মাধ্যমে ইসলামী আদেশ-নিষেধের ওপর মান্য করানোর নামই হলো রাষ্ট্রীয়নীতি। আর আমাদের জন্যেও আবশ্যকীয় যেন আমরা সেভাবে শাসন করি যেভাবে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে আমাদের বয়াত করে এবং নিজের সব স্বেচ্ছায় আমাদের ওপর ন্যস্ত করে সেক্ষেত্রে এটা জরুরী এবং আমাদের অধিকার হয়ে যায় যে সে কোন আদেশের ওপর চলতে অলসতা ও অমনোযোগিতা দেখালে তাকে শাসন করা হয়। আর তাকে একথার ওপর বাধ্য করা হয় যেন সে ইসলামী কর্মানুষ্ঠান পালন করে। কেননা, সে তো আমাদের একটি অংশ হয়ে গেছে এবং তার বদনামী প্রকারান্তরে আমাদেরই বদনামী। আর তার দুর্বলতার কারণে আমাদের মাঝেই দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। এরূপ শাসন অবশ্যই না-জায়েয ও অবৈধ নয়। কেননা, সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমাদের শাসনের অধিকার দিয়েছে। যেভাবে বোর্ডিং এ প্রবেশ করে একজন ছাত্র শিক্ষককে স্বয়ং তার ওপর শাসন করার অধিকার প্রদান করে এবং কেউ এর ওপর আপত্তি তোলে না। অবশ্য যে এটা অপসন্দ করে সে পুরোপুরি স্বাধীন। সে নিজেকে নিজ থেকে পৃথক করে নিতে পারে।

শরীয়তের পুনরুজ্জীবনের দুটি অংশ

এখন আমি বলছি, বাস্তব ক্ষেত্রে পদক্ষেপ রাখার পরে শরীয়তের পুনরুজ্জীবনের যে দুটি বড় অংশ রয়েছে তা বুঝে নেয়া দরকার। একটি অংশ সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখে। অপর অশংটি জামাতী ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। যে বিষয়গুলো সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখে ওগুলো এমনই যে, যেভাবে ইসলাম নির্দেশ দেয়, চোরের হাত কেটে দাও। অথবা ইসলাম এই শিক্ষা দেয় এটা জরুরী নয় যে, হত্যাকারীকে অবশ্যই হত্যা করা হয়। আর উত্তরাধিকারীগণের এ অধিকার রয়েছে, হয় তো হত্যাকারীকে শাস্তি দেয় বা ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু এ ইসলামী নির্দেশ যেহেতু সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখে এজন্যে আমরা এ-ও প্রবর্তন করতে পারি না। আবার ইসলাম এ-ও আদেশ দিয়েছে যে-ব্যক্তি হত্যা করেছে তাকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের হাতে সোপর্দ করা হোক যেন তারা সরকারের তত্ত্বাবধানে চাইলে স্বয়ং তারা তাকে হত্যা করে। কিন্তু এখন সরকার হত্যাকারীকে নিজেরাই ফাঁসি দিয়ে দেয় এবং উত্তরাধিকারীগণের হাতে সোপর্দ করে না। ফল এই দাঁড়ায় উত্তরাধিকারীগণের প্রাণে ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকেই যায় এবং তারা অন্য কোন সুযোগ পেলে হত্যাকারীর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবার পথ অন্বেষণ করতে থাকে। কিন্তু ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে হত্যাকারীকে হত্যা করার জন্যে প্রথম সুযোগ নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া হবে, তবে অবশ্যই এ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখা হবে, *লা ইউসরাফ ফিল কাত্‌লে* হত্যা তো নিঃসন্দেহে কর কিন্তু অত্যাচারীদের ন্যায় করবে না। বরং হত্যার জন্যে যে নীতি নির্ধারিত আছে এবং যে পদ্ধতিতে সরকার অনুমোদন করে সে অনুযায়ী হত্যা কর। সে দুর্বল চিত্তের লোক হলে এবং স্বহস্তে হত্যা করার সাহস না করলে সরকারকে বলতে পারে, আমি হত্যা করবো না। তোমরা নিজেরা তাকে হত্যার বন্দোবস্ত করো। এভাবে এ ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে। ইংরেজ সরকারের মীমাংসার পরেও যা লোকদের মনে অবশিষ্ট থেকে যায় এবং ভবিষ্যতে বহু প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি করার কারণ হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়াই শ্রেয়। আর এ অবস্থা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের আয়ত্তে। কিন্তু এসব বিষয়েও প্রকৃতপক্ষে সরকারই হস্তক্ষেপ করতে পারে। সাধারণ লোকেরা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু শরীয়তের কোন কোন অংশ এমন রয়েছে সেসবের সাথে রাষ্ট্রনীতি ও জামাতী ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সরকার এতে হস্তক্ষেপ করে না। যেমন কাদিয়ানে কাযা বিভাগ রয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কেননা, এরা স্বয়ং অনুমতি দিয়ে দিয়েছে, এমন মোকদ্দমাসমূহে যাতে পুলিশের নাক গলাতে হয় না সেগুলো

আপষে নিষ্পত্তি করে ফেলা উচিত। অতএব ইসলামী শরীয়তের সেই অংশ যাতে সরকার হস্তক্ষেপ করে না এবং যে ব্যাপারে সরকার আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে আমরা সে ব্যাপারে যেভাবে চাই মীমাংসা করি। সেক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব যেন সে ব্যাপারে আমরা জামাতীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আর আমরা শরীয়তের কোন অংশের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেও যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে এটা নিশ্চিত, এর একই অর্থ হবে আর তা এই যে আমরা শরীয়তের অবমাননা করি। অতএব এখন এ নেহায়েতই তাৎপর্যপূর্ণ ও জরুরী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমাদের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া উচিত যা খোদা তাআলা আমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে জামাতের কোন ব্যক্তির দুর্বলতা ও পদস্খলনের তোয়াক্কা যেন না করা হয়।

আমল বা কর্মের সংশোধনের মাঝে প্রথম পদক্ষেপ হলো মহিলাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ দেয়া

এ পর্যায়ে প্রথম পদক্ষেপ সেসব বিষয়ের ইসলাহ ও সংশোধন যা সুপ্রকাশিত ও সুস্পষ্ট। আজ আমি এথেকে একটি বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। একে আমরা অবলম্বন করে নিলে নিশ্চিতভাবে আমাদের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। লোকদের ধর্মহীনতা, অজ্ঞতা ও অমনোযোগিতা কেবল এ পথে অন্তরায়। অর্থাৎ কারও জন্যে অমনোযোগিতা, কারও জন্যে অজ্ঞতা আর কারও জন্যে ধর্মহীনতা এ মসলার ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। তা না হলে আজই আমাদের জামাত এ সিদ্ধান্ত নিয়ে না নিলে কাল যে এ প্রসঙ্গে সেই খারাপ কাজ সাধিত হবে না এর কোন কারণই নেই। এটি একটি জাতীয় অপরাধ ও পাপ সাধিত হচ্ছে। আর তা এই, আমাদের দেশে কৃষকদের মাঝে সাধারণভাবে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয় না। জামাতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ পঞ্চাশ বছর (এখন একশ আঠার বছরেরও অধিক সময়- অনুবাদক) কিন্তু এখন পর্যন্ত জামাতে মেয়েদের নিজেদের সম্পত্তির অংশ দেয়া হচ্ছে না। অথচ খোদা এবং তাঁর রসূল (স:) তাদের জন্যে এ নির্ধারিত করেছেন। আমার বলার উদ্দেশ্যে এটা নয় যে কোথাও এর ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয় না। স্বয়ং আমি নিজে আমাদের মা ও বোনদের অংশ দিয়ে দিয়েছি। আর মিথ্যেবাদী সেই ব্যক্তি যে বলে, আমরা আমাদের বোনদের অংশ দেই নি। কিন্তু জামাতে অধিক সংখ্যক এমন লোক রয়েছে যারা এ আদেশ প্রতিপালন করে নি। আর তাদের কন্যা, বোন, নিজেদের স্ত্রী এবং তাদের মাদের উত্তরাধিকারের অংশ দেয় না যা শরীয়ত তাদের জন্যে নির্ধারণ করেছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি, এ মসলার ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা নেবার পথে প্রতিবন্ধকতা কী? কেবলমাত্র তোমরা এই

কথাই বলতে পারো, তোমাদের ওখানে এর প্রচলন নেই? এর আর কোন জবাব তোমরা দিতে পার না। অতীত কালের মুসলমানগণ কি এর ওপর আমল করে নি? আর এটা কি লজ্জার কথা নয় আজ ইউ,পির সব গয়ের আহমদী এর ওপর আমল করে? এভাবেই সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় এমন আইন তৈরী করিয়েছে, এর ওপর চলে প্রত্যেক ব্যক্তি শরীয়ত অনুযায়ী নিজের সম্পত্তিকে বন্টন করতে বাধ্য। কিন্তু এসব আহমদী যাদের এই দাবী তারা এ বিশ্বকে বদলিয়ে এক নতুন বিশ্ব রচনা করবে এবং এই আকাশকে পরিবর্তন করে একটি নতুন আকাশ তৈরী করবে তারা তাদের মেয়েদের তাদের বোনদের আর তাদের মাদের অংশ দেয় না যা শরীয়ত মোতাবেক পাওয়া উচিত। আমি মনে করি কৃষকদের এ অসুবিধা সৃষ্টি হয় যে এভাবে তাদের অর্জিত সম্পত্তি অন্যান্য লোকদের কব্জায় চলে যাবে। কিন্তু যখন সারা জামাত এই মসলার ওপর আমল করবে এ অসুবিধাও দূর হতে থাকবে। কেননা, তার সম্পত্তি অন্যের অধিকারে গেলে অন্যের সম্পত্তিও তো তাদের কব্জায় এসে যাবে। অতএব এ মসলার ওপর আমল করার জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই আর আমি মনে করি এখন সময় এসে গেছে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি অঙ্গীকার করুক যে, ভবিষ্যতে সে এটা মান্য করবে। আর স্বীয় কন্যা, বোন, স্ত্রী ও নিজের মাকে সেই অংশ যা শরীয়ত তাদের দিয়েছে, তা দিয়ে দিবে। আর যদি তারা এর আনুগত্য করার জন্যে প্রস্তুত না হয় তাহলে তারা আমাদের সংশ্রব থেকে পৃথক হয়ে যাক। অতএব ভবিষ্যতে পরিপূর্ণভাবে নিজ নিজ জামাতে যেন এর ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করানো হয়। আর যেসব লোক এর ওপর আমল করে না তাদের ব্যাপারে কী শাস্তির বিধান করা যেতে পারে তাদের ব্যাপারে যেন চিন্তা করা হয় । এরপর কেউ যদি আমাদের শাস্তি বরদাশ্ত করার জন্যে প্রস্তুত না হয় তাহলে এসব ব্যক্তিকে জামাত থেকে বের করে দেয়া হয় যেন ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি এটা না বলে, তোমাদের এখানে শরীয়তের অবমাননা করা হয়।

জামাতে আহমদীয়ার কাছে দাবী

এখন এ মসলার গুরুত্ব সম্বন্ধে বুঝানোর পর এবং এটা প্রমাণ করে দেবার পর যে, নতুন বিশ্ব ও নতুন আকাশ এভাবে গড়া যেতে পারে যখন সুন্নত ও শরীয়ত পুনরুজ্জীবিত করা হয়। আমি আজ সেই কথা বলছি যা ইত:পূর্বে কখনো বলিনি। আর আমি জামাতের নিকট এ দাবী করছি, আপনাদের মাঝ থেকে ভবিষ্যতে যে-ব্যক্তি এ মসলার ওপর আমল করতে প্রস্তুত তিনি দন্ডায়মান হয়ে যান। (এ কথা বলার পর উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে 'লাব্বায়েক', হে আমীরুল মু'মিনীন 'লাব্বায়েক' বলতে বলতে এটা স্বীকার করলেন)। এরপর হুযূর বল্লেন, দেখো, আজ তোমাদের মাঝ থেকে প্রত্যেকে এ কথা স্বীকার করে নিলে, সেই

দুঃখ ও কষ্টের কোন ভ্রুক্ষেপ না করে স্বেচ্ছায় খোদা তাআলার ভালবাসা ও মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শরীয়তের পুনরুজ্জীবনের জন্যে স্বত:স্ফূর্তভাবে কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ ও কঠোরতা ছাড়া এ বিষয়ের জন্যে প্রস্তুত যে, তারা তাদের সম্পত্তি থেকে নিজেদের কন্যাদের এবং অন্যান্য আত্মীয় মহিলাকে সেই অংশ দিয়ে দিবে যা খোদা এবং তাঁর রসূল (স:) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব এখন যেহেতু জামাতের সদস্য হিসেবে আপনারা সবাই আমল করার অঙ্গীকার করেছেন তাই ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি যদি এর ওপর আমল না করেন তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার আদেশ দেয়া হবে অথবা অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে যা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। আর যদি তারা বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত না হয় তাহলে তাদেরকে জামাত থেকে পৃথক করে দেয়া হবে।

নারীদের অধিকারসমূহ

দ্বিতীয় কথা যা আমি বলতে চাই তা-ও সাধারণ নয়। কিন্তু যেহেতু শরীয়তের নির্দেশ এ জন্যে আমি বলছি, নারীদের অধিকারসমূহ সম্বন্ধে সব সময় খেয়াল রাখো। আর তাদের আবেগকে পদদলিত করার পরিবর্তে সেগুলোর কদর ও মর্যাদা দান করো, বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যখন তোমাদের একাধিক স্ত্রী থাকে। নিজেদের সব স্ত্রীর সাথে সমানভাবে ব্যবহার করো। এটা শরীয়তের নির্দেশ । কিন্তু আমি দেখেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ আদেশ ভঙ্গ করা হয়। আর শরীয়তের আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা করা হয় না। আর এ ধারণা করা হয় যে মহিলাগণের বক্ষে মন নেই। তা যেন পাথরের টুকরো। কোন কোন স্থানে তো কোন শরীয়তি আদেশ ছাড়া মহিলাদের এ কথার ওপর বাধ্য করা হয়, তারা তাদের পিতামাতার সাথে যেন সাক্ষাৎ না করে। আর স্বামী মনে করে স্ত্রীকে আমার অধীনে কুকুরের মত থাকা উচিত। সেই নির্বোধ একথা বুঝে না, খোদা তাআলা নারীদেরও মানুষই বানিয়েছেন এবং তাদের মাঝে আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন। তারা (অর্থাৎ পুরুষরা) কি এটা পছন্দ করতে পারে, তাদের পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে ও তাদের সেবা করা থেকে তাদের বাধা দেয়া হয়? যদি না হয় তাহলে নারীদের অনুভূতির প্রতিও তাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত। কিন্তু আমার দুঃখ হয় যাদের একের অধিক স্ত্রী রয়েছে তাদের কেউ কেউ সমানভাবে (স্ত্রীদের সাথে) ব্যবহার করে না এবং কেউ কেউ তো এত বেশি নির্যাতন করে যে তাদের স্ত্রীগণকে তাদের পিতামাতার সেবা করা থেকে এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে বাধা দেয়া হয়। এটা একটি লজ্জাজনক ব্যাপার। আর আমি মনে করি আজ আমাদের জামাতকে এ সিদ্ধান্ত করে নেয়া

উচিত এর সদস্যগণ স্ত্রীদের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। নিঃসন্দেহে শরীয়ত পুরুষদের কোন কোন অধিকার প্রদান করে। কেননা, শরীয়ত পুরুষদের অভিভাবকের মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, তাদের দ্বারা নির্যাতন ও অবিচারের অভিপ্রকাশ ঘটুক। অতএব আমাদের মাঝ থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির এ শপথ নেয়া দরকার, হয় তো তারা আগামীতে দ্বিতীয় বিয়ে করবে না আর যদি করে তাহলে হয় উভয় স্ত্রীর সাথে সুবিচার করবে নয় তো সুবিচার করতে না পারলে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিবে। তারা যদি তাদের স্ত্রীদের সাথে সমভাবে ব্যবহার না করে সেক্ষেত্রে জামাত এ দাবী করতে বাধ্য হবে, তারা এ তিনটি পদ্ধতির কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করবে। আর তারা কোন পদ্ধতিকেই অবলম্বন করতে প্রস্তুত না হলে তাদের জামাত থেকে যেন পৃথক করে দেয়া হয়।

আমানত বা বিশ্বস্ততা

তৃতীয় আদেশটি হলো আমানত বা বিশ্বস্ততা। এর প্রতি বর্তমানে লোকদের দৃষ্টি নেই। এর ব্যাপারেও জামাতের এ শপথ নিয়ে নেয়া উচিত। ভবিষ্যতে প্রত্যেক আহমদী পরিপূর্ণভাবে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হবে। কারও আমানত ও গচ্ছিত দ্রব্যের খেয়ানত বা অবিশ্বস্ততা করবে না। আমি কোন কোন লোককে এরূপ দেখেছি। কোন ব্যক্তি যখন তাদের কাছে গচ্ছিত রাখে তখন তারা নিজেদের অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে সেই গচ্ছিত ধন থেকে কিছু টাকা-পয়সা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করে ফেলে আর আমানতকারী যখন নিজের আমানত ফিরিয়ে নিতে আসেন সে সময়েই তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে দেবার পরিবর্তে বলে, কয়েক দিন ধৈর্য ধারণ করুন, আপনার টাকা আমি খরচ করে ফেলেছি। অমুক স্থান থেকে আমার টাকা-পয়সা পাওয়ার কথা আছে তা পাওয়ার পরই আপনার টাকা ফেরত দিয়ে দেবো। এভাবে তারা যেন ব্যহ্যিকভাবে বিশ্বস্ততার সাথে আমানতকৃত টাকা-পয়সা খরচ করে বসে এবং উক্ত অর্থ ফেরৎ দেবারও প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা অবিশ্বস্ত বলে পরিগণিত হয়। বিশ্বস্ততার পদ্ধতি এটাই যেভাবে কেউ গচ্ছিত রাখে সেভাবেই তা যেন পড়ে থাকে। আর যখন আমানতকারী আসে তা যেন তখন তখনই দিয়ে দেয়া হয়। দিল্লীতে হাকীম মাহমুদ খান সাহেবের পরিবার খুবই বিশ্বস্ত পরিবার হিসেবে মশহুর ও বিখ্যাত ছিল। সিপাহী বিপ্লব যখন হলো তখন লোকেরা তাদের অলিন্দে অলংকার ও কাপড়ের বদ্ধ গাঁটরী বোচ্কা নিক্ষেপ করতে করতে চলে যেত। কেননা, তিনি ছিলেন পাতিয়ালার মহারাজার রাজকীয় চিকিৎসক । আর পাতিয়ালার মহারাজা তার বাড়ীর নিরাপত্তার জন্যে বিশেষ করে একটি গার্ড বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। ইংরেজদিগকে বলে দিয়েছিলেন, ইনি যেহেতু আমার রাজকীয় চিকিৎসক এজন্যে তাকে যেন কিছু বলা না হয়। তাই যেহেতু তার

বাড়ী নিরাপদ ছিলো এবং অন্যান্য লোকদের বাড়ী ঘরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিলো না আবার তিনি খুবই মশহুর বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন এজন্যে লোকেরা পলায়নকালে আসতো এবং অলংকারাদি ও কাপড় চোপড়ের বোচকা তার অলিন্দে নিক্ষেপ করে চলে যেত। আর সেই অলংকারাদি বা কাপড় চোপড়ের কী হবে সেই বিষয়ে কোন চিন্তা করতো না। পরিশেষে সেই লোকদের মাঝ থেকে যারা সেই সময়ে গাঁটরী বোচ্কা ফেলে রেখে গিয়েছিলো দশ বিশ বছর পরে আসতো এবং তারা অবিকল নিজেদের মালামাল তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নিতো। এ দৃষ্টান্তই আমাদের জামাতের প্রত্যেককে দেখাতে হবে। আর প্রত্যেক আহমদীকে বিশ্বস্ততায় এমন মশহুর ও খ্যাতিমান হতে হবে যেন লোকেরা তার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখতেও ইতস্তত না করে এবং একজন আহমদীর নাম শুনেই লোকেরা এটা বুঝে, ইনি এমন ব্যক্তি যার কাছে টাকা-পয়সা রাখলে কোন চিন্তা নেই।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা

চতুর্থ বিষয় যার প্রতি আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো খোদার সৃষ্টির সেবা করা। তোমাদের উচিত নিজেদের হাতে কাজ করা। আর স্বয়ং পরিশ্রম করে নিজেদের গ্রাম ইত্যাদিকে পরিচ্ছন্ন কর। হিন্দুস্তানের শহরগুলোর সড়ক এবং গ্রামগুলোর গলি সাধারণত নোংরা থাকে। আমাদের জামাতের অবশ্যকর্তব্য তারা যেন ওগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দেয়। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাঁর উম্মতকে যে আদেশ-নিষেধ দান করেছেন তা এমনই রঙ্গে কার্যে রূপ দান করা যেতে পারে। আমাদের ছোট বড় নির্বিশেষে নিজ হাতে কাজ করাতে কুণ্ঠা যেন বোধ না করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে লেগে থাকে। বরং যে গ্রামে আহমদীরা সংখ্যায় অধিক সেই গ্রামকে অন্যান্য গ্রামের তুলনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে এমন বৈশিষ্ট্যপুর্ণ হওয়া দরকার যেন একজন অপরিচিত ব্যক্তিও এ রকম কোন গ্রামে যখন আসে সে যেন এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখেই বুঝতে পারে এটা আহমদীদের গ্রাম।

আহমদীদের বিচার বিভাগ

পঞ্চমত যেদিকে আমি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো এই, তাদের মামলা মোকদ্দমা যেগুলো তারা আদালতে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং যেগুলো সম্বন্ধে আইনের বাধ্যবাধকতা থাকে যেন ওগুলো আদালতে নিয়ে যেতেই হয় সেগুলো ছাড়া আমাদের কোন মামলা আদালতে যাওয়া উচিত নয়। আর শরীয়ত অনুযায়ী এসব মামলার মীমাংসা হওয়া দরকার। কোন ব্যক্তি এই

আদেশ পালনে ব্যর্থ হলে জামাতের কর্তব্য তাকে শাস্তি প্রদান করা যেন তার সংশোধন হয়। সে শাস্তি বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত না থাকলে তাকে জামাত থেকে পৃথক করে দেয়া হয়। বর্তমানে কাদিয়ানে কেবল এর ওপর আমল করা হচ্ছে। কিন্তু আমি এখন চাচ্ছি প্রত্যেক জামাতে পঞ্চায়েত বোর্ড (বর্তমানে কাযা বোর্ড) গঠন করা হোক। এটা যেন মোকাদ্দমার বিষয় মীমাংসা করে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে এ অঙ্গীকার করা উচিত, ভবিষ্যতে সে তার কোন মোকদ্দমা যার ব্যাপারে সরকারী বাধ্যবাধকতা না থাকে যে তা ইংরেজদের আদালতে নিয়ে যেতে হয়, আদালতে নিয়ে যাবে না। বরং নিজেদের আদালতী বোর্ড ও নিজেদের কাযী থেকে শরীয়ত মোতাবেক মীমাংসা করাবে। আর তারা যে মীমাংসাই করে দেন তা নিবিষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে। এ আদেশ মান্য করাতে গিয়ে জামাতের একটি অংশ বিনষ্ট হয়ে গেলেও এর কোন পরওয়া বা ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়।

দেখ, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপর যখন এই ওহী অবতীর্ণ হয় **আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু 'আলায়কুম নি'মাতী ওয়া রাযীতুলাকুমুল ইসলামা দীনা** (সূরা মায়েদা, ১ রুকূ)। তখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সময়ে একটি বাহনে দন্ডায়মান হয়ে এ ঐশী বাণী শুনালেন এবং বল্লেন, এ খোদার শেষ আমানত। আমি তোমাদের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছি। আবার তিনি বল্লেন, *হাল বাল্লাগতু* আমি কি খোদার এ বাণী তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি? সাহাবায়ে কেরাম বল্লেন, *বাল্লাগতা ইয়া রসূলাল্লাহ্*- হে খোদার রসূল! আপনি খোদার বাণী পৌছে দিয়েছেন। পুনরায় তিনি বল্লেন, আমি আমার দায়িত্বমুক্ত হয়েছি। আমিও আজ সেই আমানত, যা খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে তা পৌঁছে দিয়েছি। কেননা, আমি তোমাদের বলে দিয়েছি, খোদা তাআলা তোমাদের যে শরীয়ত দিয়েছেন তা কেবল *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্* বলার মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং সেই ধর্ম অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, চরিত্র, কৃষ্টি, সভ্যতা এবং অন্যান্য সব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এখন এটা আলেম ও জ্ঞানীগণের কাজ। তারা কুরআন ও হাদীস থেকে সেসব বিষয় বের করে এবং দুনিয়ার সামনে ওগুলো সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেন। অতএব প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে পুস্তকাদি রচনা করা হোক আর খুব দ্রুততার সাথে লেখা হোক যেন লোকেরা এতে উপকৃত হয়। বরং কোন কোন পুস্তকাদি প্রশ্নোত্তর আকারে লেখা হোক যেভাবে প্রাচীন কালে পাঞ্জাবের কোন কোন আলেম 'পাক্কিরুটি' 'মিঠটি রুটি' প্রভৃতি নামে পুস্তক রচনা করতেন যেন জামাতে প্রত্যেক ব্যক্তি খুব ভালভাবে মুখস্থ করে নেয় এবং পরে এসব কথার ওপর আমল করা জামাতের অবশ্যকর্তব্য।

নি:সন্দেহে আজ আমরা সে কাজ করতে পারি না যা সরকার ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু সেসব বিষয় যা আমাদের আয়ত্তে রয়েছে ওগুলোর ওপর আজ থেকেই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আবার ভবিষ্যত কালে পর্যায়ক্রমে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে লেখা হলে সেসব বিষয়াদির ওপর আমল করতে থাকা উচিত। জামাত এসব বিষয় স্মরণ করতে থাকে যেন এটা না হয় যে, তারা কেবল চাঁদা দিয়ে দেয় আর মনে করা হয় তাদের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। বরং ইসলামের সব রকম আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করা তাদের খাদ্য হয় এবং সুন্নত ও শরীয়তের পুনর্জীবন তাদের কর্ম হয়। এতটা পর্যন্ত দুনিয়া স্বীকার করে যেন কেবল সেই অংশ যা খোদা তাআলা ছিনিয়ে নিয়ে ইংরেজদের দিয়ে দিয়েছেন বাকী অন্যান্য বিষয়ে জামাতে আহমদীয়া প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন আকাশ ও নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। আর আমাদের মাঝ থেকে প্রত্যেকে যেখানেই বিচরণ করুক না কেন দুনিয়া তাদের দেখে এটা না বলে, এই বিংশ শতাব্দীর ইংরেজদের পশ্চাদানুসারী এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণকারী এক ব্যক্তি। বরং এটা মনে করে, এরা আজ থেকে তেরশ বছর আগে মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে মদীনার অলি গলিতে বিচরণ করছে। হে বন্ধুগণ, আমি খোদা তাআলার আদেশ আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এটা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সম্মানের প্রশ্ন কোন সাধারণ প্রশ্ন নয়। আপনারা অঙ্গীকার করেছেন, আপনারা প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট বরণ করে ইসলামের আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করবেন এবং এ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করবেন যে সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ইসলাম আদেশ দিয়েছে। আর আমি আশা করি যে, আপনাদের প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এবং রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সেসব কথার ওপর সত্বর আমল করা আরম্ভ করবেন যেগুলোর ওপর আমল করার ক্ষমতা তিনি রাখেন। এমন কি সেসব লোক যারা এটা বলে যে, আহমদীগণ রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অবমাননা করে তাদের মুখ তোমাদের কার্যকলাপ দেখে বন্ধ হয়ে যায় এবং তোমরা এ দাবী করতে পার, আমরা যদি অবমাননা করে থাকি তাহলে দেখো মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াসাল্লাম কাদের মাঝে জীবিত আছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীকার করে যে তিনি (স:) আহমদীদের সত্তায় জীবিত আছেন।

ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় অসুবিধাসমূহ

এরপর আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি। এ বক্তৃতার বহু অংশ এমন রয়েছে যা আমি ব্যাখ্যা না করে ছেড়ে দিয়েছি। এর ব্যাখ্যা আল্লাহ চাইলে অন্য পুস্তকে করা হবে। এভাবে আমি আলেমগণের মাধ্যমে পুস্তকাদি রচনা করাবার চেষ্টা

করবো। যাহোক বন্ধুগণের দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করছি। অঙ্গীকার করা খুবই সহজ হয়ে থাকে। কিন্তু কাজে রূপান্তরিত করা কঠিন। কোন কোন লোক আছেন যারা এখানে তো অঙ্গীকার করেছেন তারা তাদের মেয়েদেরকে তাদের সম্পত্তির অংশ দিবেন কিন্তু যখন ঘরে পৌঁছে এর ওপর আমল করা শুরু করবেন তখন পুত্র বলবে, আমাদের পিতা সম্পত্তি ধ্বংস করছেন। আর এভাবে তোমাদের পথে কোন কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা এখনই একটি দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করে দাঁড়াও এবং মনে রেখো কথা বলা সহজ কিন্তু কাজে পরিণত করা কঠিন। কাজে পরিণত করা যদি এতই সহজ হতো তাহলে এ বিষয়ের ওপর আপনারা আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কেননা, এটা কোন নতুন সমস্যা নয় যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। বরং আপনারা পূর্বেই এটা জানতেন। কিন্তু জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমল করতেন না। অতএব আবেগের তাড়নায় যখন চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠতে থাকে তখন অঙ্গীকার করা খুব সহজ কাজ। আর কোন কোন দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তিও এ অঙ্গীকারে যোগ দেয়। কিন্তু যখন কাজ করার সময় আসে তখন তারা বাহানা অন্বেষণে লেগে যায় আর যাদের এ কাজে নিয়োগ করা হয়ে থাকে জামাতের সেসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে আরম্ভ করে । তাই আমি জানি এর ফলে বিভিন্ন প্রকার বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা কর্মকর্তাদের বদনাম করবে। দুষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বলে তাদের আখ্যায়িত করবে। যেভাবে কাদিয়ানে যখন কোন কোন লোককে শাস্তি দেয়া হয় তখন তারা চিৎকার করতে থাকে এবং লোকদের এটা বলে না, তারা শরীয়তের অমুক অবমাননা করেছিলো যেজন্যে তারা শাস্তি পাচ্ছে, বরং এটা বলে অমুক কর্মকর্তার সাথে আমাদের ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিলো যার ফলে আমাদের এ শাস্তি দেয়া হয়েছে। এ রকম ঘটনাবলী বাইরের জামাতগুলোতেও ঘটবে।

বন্ধুগণকে উপদেশ

অতএব বন্ধুগণের উচিত যেন তারা দোয়ার ওপর অধিক জোর দেয় এবং খোদা তাআলাকেই বলে, হে খোদা, তুমি আমাদের দুর্বল স্কন্ধে সেই বোঝা অর্পণ করেছো যা তুমি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের স্কন্ধে ন্যস্ত করেছিলো। হে খোদা, আমরা আমাদের দুর্বলতাসমূহ স্বীকার করছি এবং আমাদের ভুল-ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করছি। আমাদের কোন শক্তি নেই। আমরা তোমারই সাহায্য ও তোমারই সমর্থনের মুখাপেক্ষী এবং সর্বৈব মুখাপেক্ষী। হে খোদা, তোমারই সব শক্তি। তুমি নিজ অনুগ্রহে আমাদের দুর্বল স্কন্ধগুলোকে সবল করে দাও। আমাদের জিহ্বায় সত্য প্রবহমান করে দাও। আমাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দাও। আমাদের মস্তিষ্ক উজ্জ্বল করে দাও। নিজ অনুগ্রহে সাহস

সঞ্চার কর। আমাদের অমনোযোগিতা ও আমাদের গাফেলতিসমূহ আমাদের কাছে থেকে দূরীভূত করে দাও। আমাদের মাঝে ঈমানী শক্তি সৃষ্টি করো যেন আমাদের প্রাণও যদি যায় তাহলে চলে যাক। তবুও আমরা তোমার আদেশ-নিষেধসমূহের ব্যাপারে এক অনু পরিমাণও অবাধ্যতা যেন না করি। হে খোদা, তুমি নিজ অনুগ্রহে আমাদের সৌভাগ্য দান করো যেন আমরা তোমার শরীয়ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে পারি যেন তোমার ধর্মের কল্যাণ লোকদের মোহিত করে। আর তাদেরই সেই কথার ওপর বাধ্য করে দেয় যেন তারা ইসলামে প্রবেশ করে। দুনিয়াতে মানুষ যখন একটি পাঠ মুখস্থ করে নিয়ে থাকে তখন শিক্ষক তাকে দ্বিতীয় পাঠ পড়তে দেন। আমি আশা করি, তোমরা যখন এ পাঠ মুখস্থ করে নিবে তখন আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তোমাদের পদপ্রান্তে স্থাপন করে দিবেন। আর বলবেন, তোমরা যখন এসব ইসলামী আদেশ-নিষেধকে প্রবর্তন করে দিয়েছো যে জন্যে শাসনক্ষমতার প্রয়োজন হয়নি, তখন আসো এখন শাসনক্ষমতাও তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করছি। যেন যে কয়েকটি শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অবশিষ্ট আছে ওগুলোও বিশ্বে প্রচারিত হয় এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির চারটি দেয়াল পরিপূর্ণতায় পৌছে যায়। অতএব তোমরা আমার সেসব কথার ওপর আমল শুরু করে দিলে আল্লাহ্ তাআলা শাসনক্ষমতাকেও তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করে দিবেন। আর যেসব সরকার এজন্যে প্রস্তুত হবে না আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিনাশ করে দিবেন। আর নিজের ফিরিশ্তাগণকে আদেশ দিবেন যাও তাদের সিংহাসন উল্টিয়ে দিয়ে সরকারী কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেসব লোকদের হাতে দাও যারা আমার ইসলামকে দুনিয়াতে প্রাধান্য দান করতে ব্যস্ত। অতএব যা কিছু তোমরা করতে পার কর। মনে করে নাও যে অবশিষ্ট অংশ খোদা তাআলা স্বয়ং পূর্ণ করবেন এবং তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সেই শক্তি ও কুদরত প্রত্যক্ষ করবে যে শক্তি ও মহিমা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এটি এক বিরাট কাজ অথচ আমরা বড়ই দুর্বল ও শক্তিহীন। অতএব আস আমরা খোদার কাছেই দোয়া করি। হে খোদা, তুমি আমাদের সত্যবাদী বানাও। তুমি আমাদের মিথ্যা থেকে রক্ষা করো। তুমি আমাদের হীনমন্যতা থেকে রক্ষা করো। তুমি আমাদের গাফেলতি থেকে রক্ষা করো। তুমি আমাদের অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করো। হে খোদা, তোমার নিজ অনুগ্রহে আমাদের কুরআনের ওপর আমল করার সৌভাগ্য দান করো। আমাদের ছোটদের ও আমাদের বড়দের আমাদের পুরুষদের ও আমাদের মহিলাদের আমাদের শিশুদের ও আমাদের বুড়োদের সবাইকে এ সৌভাগ্য দাও যেন তারা সবাই তোমার পূর্ণ আনুগত্যকারী হয়। আর সেসব পদস্খলন ও পাপ থেকে নিরাপদে থাকে যা মানুষের পদ-বিক্ষেপ সরল-সুদৃঢ় পথ থেকে পরিবর্তিত করে দেয়। হে আমাদের প্রভু, আমাদের অন্তরে তোমার ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও। হে আমাদের প্রভু, তোমার শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক নীতি, ধর্মের প্রতি অনুরাগ আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দাও। এগুলোর প্রতি সম্মানবোধ

আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করো। অবশেষে আমাদের হৃদয়ে সেই শিক্ষা ছাড়া আর কোন শিক্ষা যেন প্রিয় না হয় যা তুমি মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদের দান করেছো। হে খোদা, যারা তোমার প্রতি আরোপিত আর তোমার প্রিয় তারা আমাদের কাছেও প্রিয় হোক। আর যারা তোমার কাছে থেকে দূরে তাদের কাছে থেকে আমরা যেন দূরে থাকি। অথচ সারা জগতের সহানুভূতি ও সংশোধনের ধারণা আমাদের হৃদয়ে সমুন্নত থাকুক। আর আমরা সেই মহান বিপ্লব সাধনে সফলতা লাভ করি যা তুমি তোমার মসীহ মাওউদ (আ:)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছো। আমীন-আল্লাহুম্মা আমীন (তথাস্তু, হে আমাদের আল্লাহ্ তা-ই হোক)।

INQILAB-E-HAQIQI
(Real Revolution)

Islam is the REAL REVOLUTION. This will solve the baffling problems which confront mankind today, more acutely than ever before in the history of mankind. The Ahmadiyya Muslim Jama'at is to present this solution before the whole world in its proper perspective. The ways and means have been prescribed in this book in the light of the Holy Quran, Hadith and sayings of the promised Messiah[as]. This book was published in Urdu in 1938 which was a lecture delivered by the second successor of the promised Messiah Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad[ra] at the Annual Gathering of the Ahmadiyya Muslim Jama'at at Qadian on December 28, 1937.

This book has been published under the Ahmadiyya Khilafat Centenary Scheme.

INQILAB-E-HAQIQI
(Real Revolution)
Bengali Version: Prokrita Biplab

By

Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad
Khalifatul Masih II and Musleh Maud[ra]

Translated into Bengali by

Alhaj Mohammad Mutiur Rahman

Published by

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh